মাসিক
# আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৮, সংখ্যা-১১

ডিসেম্বর ২০১৯ ইং, রবিউস সানী ১৪৪১ হি., অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বাং

ربيع الثانى ١٤٤١ھ، دسمبر ٢٠١٩م

প্রতিষ্ঠাতা

**ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান** (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

**মুফতী আরশাদ রহমানী**

সম্পাদক

**মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক**

নির্বাহী সম্পাদক

**মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী**

সহকারী সম্পাদক

**মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন**

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

**মুহাম্মদ হাশেম**

**সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা**

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

## সূচিপত্র

**সম্পাদকীয়** ..... ২
**পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :** ..... ৩
**পবিত্র সুন্নাহ থেকে :**
**'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬০**..... ৪
**হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী** ..... ৭
**ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :**
**আকাবীরদের ইহসান ভোলা যাবে না-২**..... ৯
**"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :**
**সীরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা**..... ১৩
শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.
**মাজলুম বাবরী মসজিদ :**
**ইতিহাস ও নিদর্শনাবলির আয়নায়**..... ১৫
মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী আজমী
**পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে**
**'খতমে নবুওয়াত' আকীদা-১০**..... ২৪
শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ
**ইমাম বোখারী রহ. ও ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর তাকলীদ** ..... ২৯
মাওলানা আবু বকর গাজীপুরী (রহ.)
**মুসাফিরের নামায**..... ৩৪
মুফতী শরীফুল আজম
**নারীদের ভয়ংকর দশটি গোনাহ** ..... ৩৭
মুফতী আবদুর রহমান এযাযী
**চিন্তা-অভিচিন্তা**..... ৪০
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
**রাসূল (সা.)-এর বাণীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি**..... ৪৩
মাওলানা সুহাইলুল কাদের

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
**০১৯৭৮৪২৪৬৪৭**

**বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র**

**যোগাযোগ**

**সম্পাদনা দফতর**

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

**মোবাইল:** প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

## সম্পাদকীয়

# ইসলাম ও কোরআন অবমাননা 'বাক্-স্বাধীনতা' নয়–জঘন্য অপরাধ

গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ নরওয়ের 'ইসলামবিদ্বেষী' সংগঠন 'স্টপ ইসলামাইজেশন অব নরওয়ে' (এসআইএন) ক্রিসচিয়ানসান্ড শহরে ইসলামবিরোধী বিক্ষোভের আয়োজন করে। এতে পবিত্র কোরআন অবমাননা ও তাতে অগ্নিসংযোগের চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে পুরো মুসলিম বিশ্বের কলিজায় আঘাত করা হয়েছে। এর কারণে রক্তক্ষরণ হয়েছে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে। আমরা এই ধৃষ্টতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

পশ্চিমা বিশ্বের বাক্-স্বাধীনতার নামে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্রের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এই পর্যন্ত একাধিকবার এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করেছে উগ্রবাদী ইহুদি-খ্রিস্টানরা। ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এই ধৃষ্টতা মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্লোগানদাতা উন্নত রাষ্ট্রগুলো এসব ধৃষ্টতার কঠোর শাস্তি বিধানে সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণেই মূলত কিছুদিন পর পর এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে ওই সব দেশে।

জুলাই ২, ২০১২ সালে 'নাকুলা বাসিলি নাকুলা' (ছদ্মনাম 'স্যাম বাসিলি') নামক মিসরীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ইউটিউবে 'ইনোসেন্স অব মুসলিমস' নামক একটি চলচ্চিত্রের ১৪ মিনিটের ট্রেইলার 'দি রিয়েল লাইফ অব মুহাম্মদ' আপলোড করে, যাতে ইসলাম ধর্ম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা বিশ্বের মুসলমানরা এই ভিডিওটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি নিহত ও শত শত মানুষ আহত হয়। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখে ইউরোপ এবং আমেরিকার সরকারগুলো প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরপরই তারা অতীতের মতোই বাক্-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এসব জঘন্য অবমাননার নিন্দা জানাতে কিংবা ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করে। সে সময়কার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের নাগরিকদের মতামত, তা অন্যদের জন্য যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন, এসব মতামত প্রকাশে বাধা দেব না।'

তাহলে বাক্-স্বাধীনতা বলতে কি এটা বোঝায় যে লাগামহীন বা যা খুশি ইচ্ছা অশোভনীয় ও অশ্লীল মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া কিংবা যেকোনো বক্তব্য তা সমাজের জন্য যতই ক্ষতিকর বা অশান্তি উৎপাদক অথবা নৈতিক অধঃপতনের কারণ হোক না কেন, তাও অবাধে প্রচারের লাইসেন্স দেওয়া হবে? আসলে প্রত্যেক সমাজ বা দেশের আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ড অনুযায়ী বাক্-স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এ ব্যাপারে চরম বা লাগামহীন স্বাধীনতার কোনো সুযোগ নেই।

জন স্টুয়ার্ট মিল এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কেউই এটা বলে না যে কর্মতৎপরতা ঠিক চিন্তার স্বাধীনতার মতোই অবাধ। বরং ব্যাপারটি ঠিক এর বিপরীত। যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মতামত বা বিশ্বাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এ ধরনের মতামতকে অন্যদের বৈধ স্বার্থের বিরোধী কাজের জন্য উস্কানি হিসেবে কাজে লাগানো হয়, তখন এ ধরনের মতামতও প্রকাশের বৈধতা হারিয়ে ফেলে।'

জার্মান লেখক ফ্রাঞ্জ নিউম্যানও লিখেছেন : 'এমন কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই ও থাকতে পারে না, যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হবে পুরোপুরি শর্তহীন ও বাধাহীন।'

মানবাধিকার ঘোষণার চতুর্থ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'স্বাধীনতার অর্থ হলো এমন সব কিছু করার ক্ষমতা, যা অন্য কারো ওপর আঘাত হানে না বা অন্য কারো ক্ষতি করে না।'

ফ্রান্সের মানবাধিকার ঘোষণায়ও স্বাধীনতার আইনগত সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত মানবাধিকার কনভেনশনের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে বাক্-স্বাধীনতা নিঃশর্ত বা চূড়ান্ত নয়। বাক্-স্বাধীনতা ব্যক্তির মর্যাদা, জনগণের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং শৃঙ্খলার প্রতি আক্রমণাত্মক হতে পারবে না বলে ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আন্তর্জাতিক আইনেও বাক্-স্বাধীনতা সীমিত এবং এর নামে যেকোনো সীমারেখা লঙ্ঘন করা যাবে না। সেই হিসেবে বিশ্ব মুসলিম নেতাদের যথেষ্ট সুযোগ আছে, এসব ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করার। মুসলিম সরকারগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে বসে এরূপ সমস্যাসমূহ সমাধান করতে চান তবে করতে পারেন। আমরা বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাব, বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের স্বার্থে এরূপ স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হোক।

**আরশাদ রহমানী**
ঢাকা।
২৯/১১/২০১৯ ইং

# পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

## উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
## মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ

১৯। হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন–যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। (মায়েদা)

عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ - فترة এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদরা فترة এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর শেষ নবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فترة এর যমানা।

فترة এর যামানা কতটুকু : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে এক হাজার সাত শ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরদের আগমন একাধিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাইলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাঝখানে মাত্র পাঁচ শ বছরকাল পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিই فترة তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল না। (কুরতুবী)

হযরত মুসা ও ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত সালমান ফারেসীর রেওয়ায়াতক্রমে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা ও শেষ নবী (সা.)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয় শ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, انا اولى الناس بعيسى অর্থাৎ আমি ঈসা (আ.)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, ليس بيننا نبى অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁর নবুওয়াতাকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে–পরে নয়।

**অন্তর্বর্তীকালের বিধান :**

আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না?

অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ওই ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.) অথবা মুসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে এ কথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একত্ববাদ কোনো পয়গম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

**প্রশ্ন ও তার উত্তর :**

এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জিল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলিম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে কোনো সংবাদদাতা ও

*বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য*

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

# ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬০

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের ( ! ) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক 'আল-আবরার'। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে কোরআনে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দু ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

**ফাজায়েলে কোরআন–পরিশিষ্ট :**

**হাদীস নং-০১ :**

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে ইরশাদ করেন, সূরা ফাতেহার মধ্যে যাবতীয় রোগের শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য) রয়েছে।

(সুনানে দারেমী ২/৯০২ হা. ৩৪১৩, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ২/৪৫০, হা. ২৩৭০)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. এক হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী নামায পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডাকলেন। তিনি নামাযে রত থাকার কারণে জবাব দিতে পরেননি। যখন নামায হতে অবসর হয়ে হাজির হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবী নামাযের ওজর পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি কি কোরআন শরীফের এই আয়াত পড়োনি

يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে, যখনই তিনি তোমাদের ডাকবেন। (সূরা আনফাল ২৪)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে কোরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা, অর্থাৎ সর্বোত্তম সূরাটি বলে দেব? তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা হলো আলহামদু সূরার সাতটি আয়াত। এটি সাবয়ে মাসানী ও কোরআনে আযীম।

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ :مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّى، فَدَعَانِى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِى؟ فَقُلْتُ :كُنْتُ أُصَلِّى، فَقَالَ " :أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الأنفال ٢٤) ثُمَّ قَالَ :أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُوتِيتُهُ

(বোখারী শরীফ ৫/২৬৭, হা. ৪৭০৩, নাসাঈ শরীফ ৫/১১, আবু দাউদ শরীফ ২/১৫০, হা. ১৪৫৮, ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/২৪১, হা. ৩৭৮৫)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সেই জাতের কসম, যার কবজায় আমার জান, সূরা ফাতেহার মতো এরূপ সূরা আর নাযিল হয়নি। না তাওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যবুরে, না অবশিষ্ট কোরআন শরীফে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا :أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

(বোখারী শরীফ ৭/৩০, হা. ৫৭৩৭)

হাদীসটির মান : সহীহ

ঘ. এক রেওয়ায়াতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রা.)-এর ওপর এই সূরা পড়ে দম করেছেন এবং এই সূরা পড়ে মুখের লালা ব্যথার স্থানে লাগিয়েছেন।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا :ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ :عَوَّذَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَفْلًا

(মুজামুল আওসাত ৭/৬৩, মুজামুল কাবীর ৭/১৫৯, হা. ৬৬৯২, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১১৩, হা. ৮৪৫৮)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঙ. অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয়ন করে এবং সূরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পড়ে নিজের ওপর দম করে তবে মৃত্যু ব্যতীত সকল বালা-মুসিবত হতে সে নিরাপদ থাকবে।

حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهرى، حَدَّثنا غسان بن عُبَيد، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَن أَنَسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم :إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فقد أمنت من كل شيء إلَّا الموت

(মুসনাদুল বাযযার ১৪/১১, হা. ৭৩৯৩, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৩৫, হা. ৮৯৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১২১)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

চ. এক রেওয়ায়াতে এসেছে, সাওয়াবের দিক থেকে সূরা ফাতেহা সমগ্র কোরআন শরীফের দুই-তৃতীয়াংশ।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ " :أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الأنفال٢٤) " قَالَ :بَلَى وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ :تُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(তিরমিযী শরীফ ৫/১৪৩, হা. ২৮৭৫, সুনানে দারেমী ২/৯০৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

গ. সাহাবায়ে কেরাম সাপ-বিচ্ছুর দংশন করা লোকের ওপর, মৃগী রোগী ও পাগলের ওপর সূরা ফাতেহা পাঠ করে দম করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কাজকে জায়েয রেখেছেন।

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ :هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى

أَبُـو عُبَيْـدِ الـلَّـهِ الْـوَرَّاقُ حَـدَّثَـنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَـنْـصُـورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :إِنَّ إِبْـلِيـسَ لَـعَنَهُ اللَّهُ رَنَّ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ :حِيـنَ لُـعِـنَ، وَحِيـنَ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَحِينَ بُعِثَ مُـحَـمَّـدٌ صَـلَّـى الـلَّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، وَحِينَ أُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ۔

(আল জামে লি আহকামিল কোরআন ১/১০৯, তাফসীরে মুজাহিদ ৪/৫, হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২৯৯, আল আজমা [আবুশশায়খ] ৫/১৬৭৯)
হাদীসটির মান : সহীহ

চ. মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ইরশাদ করলেন, আজ আসমানের একটি দরজা খোলা হয়েছে। যা আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। অতঃপর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নাযিল হলেন। তিনি এমন এক ফেরেশতা, যিনি আজকের পূর্বে আর কখনো নাযিল হননি। অতঃপর এই ফেরেশতা আমাকে বললেন, আপনি দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনার পূর্বে আর কাউকেও দেওয়া হয়নি। একটি সূরা ফাতেহা আরেকটি সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ, অর্থাৎ শেষ রুকু।

حَـدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَـى، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ نَقِيضًا مِـنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ " :هَـذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَـوْمَ لَـمْ يُـفْتَـحْ قَـطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ :هَذَا مَـلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِـرْ بِـنُـورَيْـنِ أُوتِيتَهُـمَـا لَـمْ يُـؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ :فَـاتِحَةُ الْـكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ

(মুসলিম শরীফ ৬/৩৩২, হা. [৮০৬]২৫৪)
হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

حَـدَّثَـنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرٍ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تَعْدِلُ بِثُلُثَيِ الْقُرْآنِ

(দুররে মনসূর ১/১৫, মুসনাদে হুমাইদী ২২৭, হা. ৬৭৮, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ ৮/৩২০, হা. ৭৫৬৭)
হাদীসটির মান : হাসান

ছ. এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, আরশের খাছ খাযানা হতে আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, অন্য আর কাউকেও এই খাযানা হতে কোনো কিছু দেওয়া হয়নি। এক. সূরা ফাতেহা। দুই. আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। তিন. সূরা কাউসার।

أخـرج أَبُـو الشَّيْـخ فِـي الثَّـوَاب وَالـطَّبَـرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْـه والـديـلمى والضياء الْمَقْدِسِى فِى المختارة عَن أبى أُمَامَة قَالَ :قَـالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَربع أنزلن من كـنـز تَـحـت الْعَرْش لم ينزل مِنْهُ شَيْء غَيرهنَّ أم الْكتاب وَآيَة الْكُرْسِيّ وخواتيم سُورَة الْبَقَرَة والكوثر

(দুররে মনসূর ১/১৬)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

জ. অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত হাসান বাসারী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর ও কোরআন শরীফ পাঠ করল।

وَأخـرج أَبُو عبيد فِى فضائله عَن الْحسن قَالَ :قَالَ رَسُول الـلـه صـلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب فَكَأَنَّمَا قَرَأَ التَّوْرَاة والانجيل والزبُور والْفرْقَان

(দুররে মনসূর ১/১৬)
হাদীসটির মান : মওকুফ

ঝ. এক রেওয়ায়াতে এসেছে, শয়তানকে চারবার নিজের ওপর বিলাপ ও কান্নাকাটি করতে ও মাথার ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। এক. যখন তার ওপর লানত করা হয়। দুই. যখন তাকে জান্নাত হতে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তিন. যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুওয়াত লাভ করেন। চার. যখন সূরা ফাতেহা নাযিল হয়।

وَذَكَرَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الرَّدِّ لَهُ :حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي

# মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

**চুল রাখার শরয়ী বিধান :**

এখন চুলের বিষয় দেখুন। কেউ আপনার চুল দেখে, আপনার মাথা দেখে কিভাবে বুঝতে পারবে আপনি একজন মুসলমান। এই জন্যও শরীয়তের বিধান আছে যে চুল কিভাবে রাখতে হবে। প্রত্যেক বিষয়েই শরীয়তের বিধান আছে সে মতেই মুসলমানদের চলতে হবে। নিজের মনের ইচ্ছামতো করা যাবে না। চুল রাখার তিনটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হলো, যদি চুল রাখার ইচ্ছা হয় চুল রাখেন। কিন্তু কত বড় রাখতে পারবেন, তার একটা সীমা আছে। এমন নয় যে যত ইচ্ছা বাড়তে থাকুক। একসময় ইংরেজদের একটা পদ্ধতি ছিল। তা হলো চুল একটা সীমা পর্যন্ত গেলে কেটে ফেলতে হতো। এখন বলা হচ্ছে না চুল বৃদ্ধি করা দরকার। ঠিক আছে, যদি চুল লম্বা রাখতে ইচ্ছা হয় রাখেন, কিন্তু তার যে সীমা আছে সে পর্যন্ত রাখেন। চুল রাখার সীমা হলো কানের লতি পর্যন্ত লম্বা রাখা। আরেকটি হলো চুল কামিয়ে ফেলা।

ان السنة فى شعر الرأس اما الفرق واما الحلق

মাথার চুল রাখার সুন্নাত হলো বাবরী রাখা বা হলক করে ফেলা। (ফতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৫৭)

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, ছোট ছোট করে রাখা। সেরূপও রাখা যায়, তবে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় হলো পুরো মাথা সমান হওয়া। সব চুলই যেন সমান্তরাল থাকে। ছোট-বড় যেন না হয়। এই পদ্ধতিতে চুল রাখার বিধান আছে এবং এই তিন পদ্ধতিই শরীয়তসম্মত। কিন্তু এখন চুল রাখার যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও ফ্যাশন চালু হয়েছে, চিন্তা করেন সেগুলো শরীয়তের বিধান মতে আছে কি না? আজ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হলো যে যেভাবে ইচ্ছা, চুল রাখে। কারো কাছে একটা ফ্যাশন দেখেছে সে মতেই সবাই রাখতে আরম্ভ করে। এমন হওয়া উচিত নয়। বরং আগে শরীয়তের বিধান জেনে নিন। তার পর সে মতে রাখুন।

**মোচ রাখার সুন্নাত তরীকা :**

এরপর তৃতীয় বিষয় হলো মোচ। এর মাধ্যমেও মুসলমানদের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু লোকের মাথায় চুলই থাকে না। তবে তাকে মোচ দ্বারা চিনতে পারবে তিনি একজন মুসলমান। মোচের ব্যাপারে হুকুম হলো :

احفوا الشوارب

মোচ ছোট করো। (বোখারী শরীফ ২/৮৭৫, হা. ৫৯১৩) যথাসম্ভব তা ছোট করো। মেশিন দিয়েও তা করা যায়, কেচি দিয়েও। মোচ সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে শব্দগুলো এসেছে, তা থেকে বোঝা যায় ছোট করা এবং অতি ছোট করা। ফিকহের কিতাবে মোচ সম্পর্কে এভাবে আছে–

মোচ এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে ঠোঁটগুলো দেখা যায়।

القص منه حتى يوازى الحرف من الشفة العليا فسنة بالاجماع

মোচকে এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে ঠোঁটের ওপরের কিনারা বরাবর হয়। তা ঐক্যবদ্ধ মতের ভিত্তিতে সুন্নাত। (রাদ্দুল মুহতার ৬/৪০৭)

ينبغى للرجل ان يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحجاب

পুরুষের জন্য উচিত হলো মোচগুলো খুব ছোট করে কাটবে। (আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া ৫/৩৫৮)

فكل هذه الالفاظ تدل على ان المطلوب المبالغة فى الازالة

এই শব্দ থেকে বোঝা যায়, মোচ ছোট করার ক্ষেত্রে অতি ছোট করাই উদ্দেশ্য। (ফতহুল বারী ১০/৩৪৭)

**দাড়ির শরয়ী বিধান :**

মোচের পরে হলো দাড়ি। এটিও ইসলামী উর্দি আর ইসলামী বেশভূষার ক্ষেত্রে জরুরি একটি বিষয়। দাড়ি বলা হয় ওই চুলকে, যা মুখমণ্ডল ও থুতনির ওপর গজিয়ে থাকে।

اللحية اسم لجمع من الشعر مانبت على الخدين والذقن

দাড়ি ওই চুলগুচ্ছের নাম, যা দুই গণ্ডদেশ ও থুতনির ওপর গজায়। (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ৪/৪৭৮)

দাড়ি দাঁতের মাড়ি থেকে আরম্ভ হয়। আরবী لحى বলা হয় ও হাড়কে, যার ওপর দাঁত স্থির থাকে।

اللحى العظم الذى عليه الاسنان

ওই হাড়, যার ওপর দাঁত বসে থাকে। (উমদাতুল কারী)

দাড়ির বিধান হলো, কানপট্টির নিচে যে হাড় সামান্য উঁচু হয়ে থাকে সে থেকে দাড়ি আরম্ভ হয়। ওই হাড়ের ওপর যে চুলগুলো গজায় তা কাটা এবং কামানো জায়েয নেই। এর ব্যাপারে বিধান وفروا اللحى দাড়ি লম্বা করো। (বোখারী শরীফ ২/৮৭৫, হা. ৫৯১৩)

এটি শরীয়তের বিধান। তাই এ ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামতো কিছু করা যাবে না। তবে শরীয়তে সব কিছুর যেমন একটা সীমা আছে, দাড়ির ব্যাপারেও একটা নির্ধারিত সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করলে তাতে কেচি লাগানো যাবে। আমি মুম্বাইয়ে এই বয়ান করার পর এক ব্যক্তি বললেন, রাসূল (সা.) দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন, আপনি এক মুষ্ঠি রাখার কথা কোথায় পেলেন? ওই লোকের দাড়ি

নাভির নিচ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। বেঙ্গালুরে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর দাড়ি তো মাশাআল্লাহ হাঁটু পর্যন্ত। আমি বললাম–হ্যাঁ, সীমা আছে। তিনি বললেন, কোথায় আছে। আমি বললাম, হাদীস শরীফে এসেছে–

ان النبى ﷺ كان يأخذمن لحيته من عرضها وطولها

রাসূলুল্লাহ (সা.) দাড়ির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থেকে কেটে নিতেন। (তিরমিযী শরীফ ২/১০৫)

এখন এই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কতটুকু হলে নিতেন তা কে বলবে? তা কিভাবে আমরা জানব? স্পষ্ট কথা হলো তা ওই সকল লোকই জানতেন এবং বলতে পারতেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন। রাসূল (সা.)-এর আমলকে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। তাঁদের থেকে জানতে পারা যাবে দাড়ির ওই পরিমাণটা কতটুকু ছিল? কারণ তাঁদের দাড়িও এমন ছিল, যেমন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং আমরা সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকাই। হযরত উমর (রা.) বলেন,

خذوا ما تحت القبضه

মুঠোর নিচে যে দাড়ি লম্বা হবে তা কেটে ফেলো। (গুনিয়াতুত্তালেবীন ১/১৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

انه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة۔

তিনি নিজের দাড়িকে মুঠ করে নিতেন। অতঃপর মুঠ বরাবর নিচেরগুলো কেটে ফেলতেন। (নাসবুর রায়া ২/৪৫৮, হা. ৩৭৮৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আমল ছিল এমন :

كان يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن القبضه

তিনি দাড়িকে মুঠ করে তার থেকে বাড়তিগুলো কেটে ফেলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১৩/১১২, হা. ২৫৯৯২)

সাহাবায়ে কেরামের বাণী এবং আমল থেকে আমরা জানতে পারলাম দাড়ি এক মুঠো বরাবর রাখাই শরয়ীতের সীমা। শরীয়তের হদ অনেক সময় বাণীর মাধ্যমে পাওয়া যায় আবার কোনো সময় আমলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সুতরাং দাড়িকে লম্বা করা এবং এর শরয়ী সীমা জানতে পারলাম। এই কারণে উলামায়ে কেরাম বলেন, শরয়ী সীমা পর্যন্ত দাড়ি রাখা ওয়াজিব। বিতির নামায যেমন জরুরি, ঈদের নামায যতটুকু জরুরি, শরীয়ত মতে দাড়ি রাখাও ততটুকু আবশ্যক। কোরবানী করা যেমন আবশ্যক, দাড়ি রাখাও সেরূপ আবশ্যক। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) লেখেন :

حلق كردن لحيه حرام است وروش افرنج وهنود است، وگذاشتن آں بقدر قبضه واجب است

দাড়ি চাঁছা হারাম। এটি ইংরেজ এবং হিন্দুদের নিয়ম। এক মুঠো পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

আমি শরয়ী গাইরে শরয়ী এই জন্য বললাম যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! দাড়িও কি শরয়ী হয় নাকি? আমি বললাম, মুসলমানদের প্রত্যেক বিষয়েই শরীয়ত আছে। রমাজানের ৩০ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা ফরয। সেটা শরয়ী। আবার শাওয়ালের ১ তারিখ ঈদ। সেটাও শরয়ী। কিন্তু ওই দিন রোযা রাখা হারাম, শরীয়তপরিপন্থী। ফজরের নামায আদায় করতে পারেননি। সূর্য উঠার চার পাঁচ মিনিট বাকি আছে। ওই সময় দুই রাক'আত নামায পড়ে নেওয়া ফরয। কিন্তু যখন সূর্য উদয় হতে আরম্ভ করল তখন নামায পড়া হারাম, শরীয়তপরিপন্থী। সুতরাং যেসব কাজ শরীয়তের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত সেগুলো শরয়ী, যেগুলো শরীয়তের সীমারেখার বাইরে সেগুলো গাইরে শরয়ী বা শরীয়তপরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলে কিভাবে দণ্ডায়মান হবে?

বন্ধুগণ! নিজেরাই চিন্তা করেন। যে লোক দাড়ি রাখে না তাকে ইমাম বানাতে পারবেন না। তার দ্বারা ইকামত দেওয়ানোর অনুমতি নেই। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। জজ সাহেবের প্রতিনিধির জন্য বিভিন্ন শর্ত হতে পারে, বিচারক সাহেবের প্রতিনিধির জন্য যদি বিভিন্ন শর্ত থাকতে পারে তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধির জন্য কোনো শর্ত থাকবে না, তা কী করে হয়? আল্লাহর দরবারে হাজেরি দেবে, হযরত বেলাল (রা.)-এর স্থলে দাঁড়াবে কিন্তু তাঁর আকৃতি থাকবে না, এমন লোক কিভাবে ওই স্থলে দাঁড়াবে। কী অবস্থা একটু চিন্তা করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থানে দাঁড়াবে তাঁর সীরাত আর আকৃতি থাকবে না, এমন লোক কিভাবে ইমামতি করবে? ওই স্থলে দাঁড়াবে? এসব খুব চিন্তা করার বিষয়। সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে?

অনেক লোক আছে, দাড়ি রাখে। কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। সামনের দিকে এক মুঠ পরিমাণ থাকে আর দুই পাশে কম রাখে, বা অনেকেই দুই পাশে একেবারেই রাখে না। এসব অজ্ঞতার আলামত। বরং সামনের দিকে যেমন এক মুঠ রাখতে হয়, দুই পাশেও একই বরাবর রাখতে হবে। আর প্রত্যেকের নিজের হাতের মুঠ হিসেবে রাখতে হবে। নাপিতের হাতের মাপে নয়। এসব বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এসব ইসলামের ইউনিফর্ম ও রূপ-আকৃতিতে ওয়াজিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আজকে উম্মতের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই এসব বিষয়ের গুরুত্ব কম। এর গুরুত্ব বুঝতেই চায় না। তাই সেই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করলাম।

# ইফাদাতে

## হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

*বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত*

# আকাবীরদের ইহসান ভোলা যাবে না-২

**রেশমি রুমাল আন্দোলন :**

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জমিয়াতুল আনসার নামে একটি সংগঠন করা হলো। এই সংগঠনের মাধ্যমে ১৯০৭ সালে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রেশমি রুমাল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যদি এই সময় কিছু লোক বিশ্বাসঘাতকতা না করত হয়তো তখনই হিন্দুস্তান ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু তখন হিন্দুস্তান স্বাধীন হতে পারেনি। তবে এই আন্দোলন আফগান স্বাধীনতার মূল বুনিয়াদ প্রমাণিত হয়। যার কারণে প্রতিচ্যে এক নতুন উদ্যম ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ সালের রেশমি রুমাল আন্দোলনের নেতা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.), হযরত মাওলানা সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), হযরত মাওলানা উযাইর গুল (রহ.), হাকীম নসর হোসাইন (রহ.) প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দী (রহ.), মাওলানা বরকতুল্লাহ ভুপালী (রহ.), মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মনসূর আনসারী (রহ.) প্রমুখ দেশান্তরিত হন। তখন পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি তাঁদের সহকর্মী যাঁরা হিন্দুস্তানে ছিলেন তাঁরা নতুন রূপে আবির্ভূত হন। ১৯১৯ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পাশাপাশি তাঁরা আজাদী আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা রাখেন। বরং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আত্মিক, দৈহিক এবং আর্থিক কোরবানী ছিল কংগ্রেস থেকেও অনেক বেশি এবং অগ্রগামী। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পূর্ণ আজাদী হাসিল হয়। আফসোস, ইংরেজদের জাদু কার্যকর হয়ে যায়, তারা হিন্দুস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এর শাহী রগের খুন চুষে নেয়।

যেভাবেই হোক, যেটুকু আজাদী অর্জিত হয়েছে, যেটুকু নাজাত মিলেছে এতে আমাদের আকাবীরদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। তাঁদের ত্যাগই ছিল সবচেয়ে অধিক। তাঁদের মোবারক নামই এই শিরোনামে সর্বাগ্রে অঙ্কিত।

আপনি উলামায়ে দেওবন্দ ব্যতীত শামেলী যুদ্ধে জিহাদ করেছেন এমন কাউকে দেখাতে পারবেন না।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) থানাভবনে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, মোল্লা উমর আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুম প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, যদিও উলামায়ে দেওবন্দ সময় বিশেষে পরাজিতও হয়েছেন; কিন্তু মুজাহিদদের যে আসল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ খেদাও তাতে পুরোপুরি কামিয়াব হয়েছেন। ইংরেজকে উপমহাদেশ ছাড়তে হয়েছে এটি তাদের পরাজয়। উলামায়ে দেওবন্দের বিজয়। মোল্লা উমর আফগানিস্তানে পরাজিত হননি বরং মূলত পরাজিত হয়েছে আমেরিকা, সময়ে তা প্রমাণ করবে। তা মানতে হবে।

আমাদের আকাবীরগণ ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে সর্বক্ষণ আন্দোলন জারি রেখেছিলেন। সর্বশেষ হযরত শায়খুল হিন্দের হাতে নেতৃত্ব আসে। তিনি রেশমি রুমাল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। শামেলী যুদ্ধে তোপ কামান নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) রেশমি রুমাল নিয়ে জিহাদ করেছেন। দেওবন্দ থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে আফগানিস্তান, সেখান থেকে তুর্কি, সেখান থেকে সৌদি আরব ও মক্কা-মদীনা।

**রেশমি রুমাল আন্দোলন কী?**

তা জানার জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা দেওবন্দ থেকে আফগানিস্তান, তুর্কি, সৌদি আরব পর্যন্ত চেষ্টা করেছে; কিন্তু সফল হয়নি। এটি ছিল একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল ছিল তুর্কিকে নিয়ে ইংরেজদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা। তুর্কির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে চুক্তি হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায় বসে। এই আন্দোলন খতম করার জন্য ইংরেজরা জার্মানিকে কাজে লাগিয়ে তুর্কিকে পরাজিত করে দিল। যার কারণে আমাদের আকাবীরদের উদ্দেশ্য ব্যার্থ হয়ে গেল। হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) জেলখানায় বন্দি হয়ে গেলেন। হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) উস্তাদের খেদমতের জন্য নিজেই জেলখানায় গেলেন।

এরপর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত

হয় হযরত সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে।

**করাচির জেলখানায় হযরত মাদানী (রহ.) :**

হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সর্বপ্রথম ঘোষণা ছিল, ইংরেজ বেনিয়াদের অধীনে চাকরি করা হারাম। এই ফাতাওয়া দেওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে করাচির জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মোকাদ্দমা চলতে থাকল। এর ফায়সালা জেলখানায় হবে, আদালতেও হবে না। বরং এর ফায়সালা শোনানো হবে করাচি থেকে দূরে এক ধু ধু ময়দানে। চতুর্দিকে কাঁটাতারের ঘেরাও দিয়ে এজলাস বসানো হলো। যাতে দূর থেকে লোকেরা দেখতে পায়। চতুর্দিকে কামান আর বন্দুক নিয়ে সশস্ত্র ফৌজ উপস্থিত। লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়ে দূর থেকে দেখতে ছিল। তাদের মধ্যে এ কথা প্রচার পেল যে আজ হোসাইন আহমদ মাদানীকে ফাঁসি দেওয়া হবে। হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর উকিল এসে তাঁকে বললেন–হুজুর, আপনি শুধু এ কথা বলে দেবেন যে এই ফাতাওয়া আমি দিইনি। তখন তো ইনশাআল্লাহ আপনার রেহাই হয়ে যাবে। অন্যথায় রেহাইয়ের কোনো পরিস্থিতি নেই বরং ওই স্থানেই আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। হযরত মাদানী (রহ.) তাঁকে কিছুই বললেন না। এজলাস আরম্ভ হলো। মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার বিভিন্ন আয়োজন করা হলো। হাজারো সশস্ত্র ফৌজ অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। হাজারো ফৌজকে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানীর পেছনে নিয়োগ করা হয়েছে। ফৌজের গাড়িবহরের সামনে হযরত মাদানী (রহ.)-কে উঠানো হলো। তারা এমন একটা ধারণা দিতে চাচ্ছিল যে, হোসাইন আহমদ মাদানী একজন বড় আসামি। তাঁর আজ সর্বোচ্চ সাজা হবে। যাতে মুসলমানগণ ভীতি-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জজ ছিলেন ইউরোপিয়ান।

এজলাস বসল। জজ সাহেব হযরত মাদানী (রহ.)-এর উকিলকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মুয়াক্কেল থেকে জিজ্ঞেস করুন যে, ইংরেজদের অধীনে মুসলমানদের চাকরি করার ফাতাওয়া তিনি দিয়েছেন কি না? হযরত মাদানী (রহ.) জজের প্রশ্ন বুঝে ফেলেছেন। তখন তিনি নিজেই জজের সামনে জবাব দিতে আরম্ভ করলেন। তখন হযরত মাদানী (রহ.) তিনটি বাক্য বলেছেন। ১। আমি এই ফাতাওয়া দিয়েছি। ২। এখনো এই ফাতাওয়া দিচ্ছি। ৩। যদি আগামীতে বেঁচে থাকি তখনও ইনশাআল্লাহ এই ফাতাওয়া দেব। ইংরেজদের অধীনে মুসলমানদের চাকরি করা হারাম। অতঃপর বললেন, আমাকে জানানো হয়েছে যদি আমি এরূপ বলে থাকি তবে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে, গুলি করা হবে। তখন তিনি শেরওয়ানির বোতাম খুলে দিলেন এবং বললেন, হোসাইন আহমদের বক্ষ উন্মুক্ত আছে।

হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সেদিন শেরওয়ানির যে বোতামগুলো খুলে ছিলেন, তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এই বোতাম আর বন্ধ করেননি। বরং বুক সব সময় খোলা ছিল।

তাঁরাই ছিলেন আমাদের আকাবীর। আমাদের মাঝে কি এসব কথার চর্চা আছে? তাঁদের আমরা স্মরণ করে থাকি?

**হযরত মাদানীর ব্যাপারে জজের শুনানি :**

জজ সাহেব ফায়সালা লিখলেন। তাতে লিখলেন, এই মোজাহিদ শুধু ধর্মীয় নেতা নন বরং পুরো দেশের জন্য একজন বড় আমানত। জাতির নেতা এবং কায়েদে আজম। জাতির জন্য বড় ভাণ্ডার। তাঁর জীবন দীর্ঘ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে না। তবে যেহেতু এরূপ ফাতাওয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে বড় অপরাধ তাই তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

বন্ধুগণ! দেওবন্দী ছাড়া কারা ছিল এই উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের জিহাদে? ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ইসলাম থেকে বের করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। কাদিয়ানী ইংরেজ ষড়যন্ত্রের ফসল। ওয়াহাবীরা ইংরেজ ষড়যন্ত্রের ফসল। এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়ও দেওবন্দীরা ছাড়া ময়দানে কারা ছিল? হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) ময়দানে নেমেছিলেন। হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী ময়দানে নেমেছেন। কাদিয়ানীদেরকে উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো। হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর শাগরেদ হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.), মুফতী মাহমুদ সাহেব (রহ.) পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করিয়েছিলেন। উস্তাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, আর ছাত্রগণ তাতে পূর্ণতা দান করেছেন। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) ও এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) ইংরেজ খেদাও আন্দোলন শুরু করেছিলেন আর হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। এই ইংরেজদের মাধ্যমে উপমহাদেশে গাইরে মুকাল্লিদের ফিতনার অনুপ্রবেশ করেছিল। কারণ এখানে সকল মুসলমানই মুকাল্লিদ

ছিলেন। বিশেষ করে ৯৯ শতাংশ মুসলমানই হানাফী। ইংরেজ ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট গাইরে মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) মাঠে নামলেন। তাঁর যৌক্তিক কর্মপন্থায় গাইরে মুকাল্লিদগণ এমনভাবে ঘরে প্রবেশ করে ছিলেন যে, শত বছর ঘর থেকে বের হতে আর সাহস করেনি। সম্প্রতি সৌদির অর্থায়নে তারা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সুতরাং আকাবীরদের আমানত হিসেবে তাদের মোকাবেলাও দেওবন্দীদেরই ময়দানে আসতে হবে।

**ইহুদি ষড়যন্ত্র :**

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে একজন বদদ্বীন, যে আলেমও নয়, কোনো সনদই ছিল না তার, যার নাম ছিল গোলাম আহমদ পারভেজ নতুন ফিতনা নিয়ে মাঠে এল। তার ফিতনা হলো হাদীস অস্বীকার করার ফিতনা। হাদীস যখন অস্বীকৃত হয়ে যাবে তবে কোরআনের কোনো মূল্য থাকবে না, মুসলমানগণ ইসলাম নিয়ে থাকতে পারবে না। এই ইহুদি-নাসারা ফজলুর রহমানের ইসলাম নামেও এক বিশাল ফিতনা তৈরি করেছিল। পাঞ্জাবে তার জন্ম। প্রায় সব ফিতনার গোড়াপত্তন হয়েছে পাঞ্জাব থেকে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, গোলাম আহমদ পারভেজ, ফজলুর রহমান–সবই পাঞ্জাবে জন্ম নেওয়া। ফজলুর রহমানের ইসলাম একটি পরিভাষা। যা কিতাব আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। যার মোকাবেলার আন্দোলনে আইয়ুব খান ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। ওই পাঞ্জাব থেকেই জেনারেল শিক্ষিত এক লোক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। অর্থাৎ আবুল আলা মওদূদী। তার সুমিষ্ট বক্তৃতা ও শৈলীপূর্ণ লেখা দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিষ বিস্তার করে ঈমানের স্থলে কুফরীর অনুপ্রবেশ করাতে লাগল। এই ষড়যন্ত্র সর্বপ্রথম আঁচ করতে পারা ব্যক্তি হলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। তাঁর লেখা পড়ে হযরত থানভী (রহ.) বলেছিলেন, আমার মেধা তা কবুল করছে না। হযরত থানভী (রহ.)-এর এই কথার ব্যাখ্যায় হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সর্বসাধারণে এ কথা তুলে ধরলেন যে, মওদূদী গোমরাহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ। মওদূদী মুতাযিলা আর খারেজীদের আকীদা পোষণ করে। তখনও উলামায়ে দেওবন্দ এই বিষয়ে সোচ্চার হননি। পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল। মওদূদী সাহেব নিজের মিশনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুন্দর সুযোগ এলো। লাহোরের মতো একটি শহর তিনি পেলেন। যা পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত। করাচিতে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) এবং বাংলাদেশে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) মওদূদীর সুন্দর লেখনী দেখে খুশি হয়ে গেলেন। এদিকে হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) জনসমক্ষে ঘোষণা করছেন, মওদূদী খারেজী এবং মুতাযিলা আকীদা গ্রহণ করেছে। তার অনুসারীরা তার মতোই হয়ে যাবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। পরে অবশ্য সকলের চোখ খুলে গেল। হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) ও হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)ও লেখে দিলেন মওদূদী গোমরাহ। তার অনুসরণ করা যাবে না। এর মাধ্যমে সকল উলামায়ে কেরাম এ কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন যে, মওদূদী গোমরাহ।

সকলের ঐক্যবদ্ধ মত চলে আসার পর দলিল তলব করা পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে। একজন হক্কানি আলেম দেখান যিনি মওদূদীর চিন্তাধারাকে সহীহ বলেছেন এবং এই দাবির উপর অটুট থেকে ইন্তিকাল করেছেন। হতে পারে কেউ কেউ মওদূদীর বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধোঁকা খেয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের প্রতারিত অবস্থায় মউত দেন না। বরং সকলে শেষে তাওবা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং করেছেন। নবীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু যাঁরা নবী নন তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুদরতিভাবেই ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের আকাবীরদের যে কেউ এই ধোঁকার শিকার হয়েছিলেন, সকলে ইন্তিকালের পূর্বে সব কিছু বুঝতে পেরে তাওবা করেছেন। হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ভুল সংশোধন বই লেখেছেন। আল্লামা বিন্নুরী (রহ.) আল উস্তাদুল মওদূদী কিতাব লিখেছেন। হযরত মুফতী শফী (রহ.) মকামে সাহাবা কিতাব লিখেছেন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) নিজ কিতাবে লেখেন, আমি মওদূদীর ব্যাপারে এর পূর্বে যা লিখেছি সবই মনসূখ-রহিত। এই লেখা রহিতকারী। মওদূদী গোমরাহ এবং গোমরাহকারী। এরূপ সব ফিতনার মোকাবেলা দেওবন্দীরা ছাড়া আর কারা করেছে?

যখন ইংরেজ এখান থেকে বিতাড়িত হলো, দেশ বিভক্ত হলো, হিন্দুস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন হযরত মাদানী (রহ.)-কে এমন একটি উপাধি দেওয়া হলো, যা রাষ্ট্রপ্রধানদেরও দেওয়া হয় না। ৬টায় রেডিওতে তা ঘোষণা করা হলো, ১১টায় অত্যন্ত বিনয়ের সহিত

এর জবাব এলো যে, হযরত মাদানী (রহ.) এই উপাধি নাকচ করে দিয়েছেন এবং বলেছিলেন, হিন্দুস্তানে ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কোনো উপাধি পাওয়া নয় বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। যদিও কিছুদিনের জন্য হিন্দুস্তানের মুসলমানদের কষ্ট হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলাহ এর মাধ্যমে পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের আজাদ করে দেবেন।

নকশে হায়াত কিতাব (যা তিনি ভারত বিভক্তির পূর্বে লিখেছেন) তাতে হযরত মাদানী (রহ.) লেখেন, একবার যদি হিন্দুস্তান আজাদ হয়ে যায় তবে পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের আজাদী মিলবে। তেমনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ পূর্ব-পশ্চিমে অনেক দেশ আজাদ হয়েছে। আবার হযরত মাদানীই (রহ.) লিখেছেন, যদি ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হয় তবে সেই পাকিস্তান হবে আমেরিকার বাণিজ্যকেন্দ্র। মুসলমানদের কোনো লাভ হবে না। এ কথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং স্লোগান চলছিল মাত্র। সেরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর কিতাবে রয়েছে। যাহোক, ভারত স্বাধীন হলো, পাকিস্তান হলো।

ভারতে যখন সংসদ গঠন হচ্ছিল তখন হযরত মাদানী (রহ.)-এর সামনে আর্জি পেশ করা হলো, হযরত! আপনি তাশরীফ আনেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপনাকে সোপর্দ করতে চাই। হযরত মাদানী (রহ.) তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, হিন্দুস্তানকে আজাদ করার জন্য যে সামান্য খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছি তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। পুরো দুনিয়ায় মুসলমানদের আজাদী এবং মুক্তির জন্য করেছি। মুসলমান এবং ইসলামের ইজ্জত রক্ষায় করেছি। মন্ত্রী হওয়ার জন্য করিনি।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, ভাইয়েরা, আমি আর আগে যাচ্ছি না। আপনাদের সামনে আকাবীরদের অনেক কথা বলে ফেললাম। এসব আকাবীরের এহসান ভোলা যাবে না। তাদের এহসান তখনই ভোলা হবে না, যদি তাদের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা না করি। তাদের নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে না বরং তার ওপর অবিচল থেকে তাদের সাথে ওয়াফাদারীর প্রমাণ পেশ করতে পারি। তাদের নীতি- আদর্শ জানতে হলে, তার ওপর অটুট থাকতে হলে আমাদেরকে তাদের ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে। তখনই আমরা আকাবীরদের কিতাবাদি থেকে ইস্তিফাদা করতে পারব। তাদের ইলমী খাজানা থেকে আলোচ্ছটা আহরণ করতে পারব। সুতরাং সেটাও একটি ওয়াফাদারীর নমুনা এবং প্রমাণ।

খুব চিন্তা করার বিষয়। আমি তাজরাবা থেকে বলছি। আমরা যারা মাদরাসাওয়ালারা আছি, তাদের পরামর্শে এই ইজতিমা ডাকা হয়েছে। আপনারা এই ইজতিমা থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। বাহ্যিক উন্নয়ন মূলত দ্বীনি মাদারিসের মূল উন্নতি নয়। আমাদের আকাবীরদের নমুনা, নীতি-আদর্শ আমাদের আলোকিত পাথেয়। দ্বীনি মাদরাসার রুহানি ও অন্তর্গত উন্নতিই মূল উন্নতি। রুহানি তারাক্কীর জন্য আমাদেরকে রুহানিভাবেই তৈরি করে নিতে হবে। রুহানিভাবে যখন আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠে আসব তখন দূরদৃষ্টি ও ফেরাসাত অর্জিত হবে।

আমি সব সময় প্রত্যেক বিষয়েই আকাবীরদের নমুনা ও নীতি-আদর্শ অটুট রাখতে চেষ্টা করি। তাদের নীতি-আদর্শের বেলায় ছাড় দেওয়া হবে না। অনেকে বলে, একসময় আপনাদেরকে সরকার বাধ্য করবে, দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষা, নেসাব ইত্যাদির ব্যাপারে। আমি তাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছি, আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই স্বীকৃতি হতে হবে। আকাবীরদের নেসাবই অটুট থাকতে হবে।

আমি তো ভাই! এমন পদক্ষেপ নিতেও দ্বিধা করব না, যদি আকাবীরদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে হয় তবে আমার মাদরাসায় আমি দাওরায়ে হাদীস আর মেশকাত ক্লাস বন্ধ করে দেব। সমস্যা কী? আমি ছোট মানুষ হিসেবে চেয়েছিলাম ছোট আকারে দারুল ইফতা নিয়ে থাকব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কারিশমা, হতে হতে এত বড় মারকায হয়ে গেল। দাওরায়ে হাদীসও আমি নিজে খুলিনি। বরং এখানে দেশের বড় বড় মুরব্বিদের যাতায়াত ছিল। কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, দাওরায়ে হাদীস খোলার জন্য। সেটারও একটা ইতিহাস আছে। কোনো সময় বলব ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, বন্ধুগণ! এখানে সকলে আলেম-উলামা। মাদরাসার জিম্মাদার, বড় বড় মুহাদ্দিস-মুহতামিম আছেন। সব বিষয়ে আকাবীরদের নীতি-আদর্শই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি বিষয়েই তা অনুকরণ করতে হবে। যদি তাদের আদর্শ থেকে সরে যাওয়া হয়, কোনো বিষয়ে তাদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় তা হবে তাদের শত বছরের ত্যাগ কোরবানীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

(ফুয়ূজে রহমানী অবলম্বনে)

# সীরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা

শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

সীরাত অর্থ–সুন্নাত, পথ, অবস্থা ও পথচলা পরিভাষায় সীরাত বলা হয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনচরিতকে। কারও কারও মতে, সীরাত বলা হয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, অবয়ব-আকৃতি, চারিত্রিক গুণাবলি এবং তাঁর আলোকময় জীবন সৌন্দর্যকে–তা নবুওয়াতের পূর্বের হোক বা পরের। (আহাম্মিয়াতুদ দিরাসাহ ১/৩, কাওয়াইদুত তাহদীস; পৃষ্ঠা ৩৫)

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবন গড়ার জন্য নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ নকশা হিসেবে জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ : তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব- ২১)

এর পাশাপাশি নবীজির অনুসরণের নির্দেশও কোরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। আর কারো অনুসরণের জন্য তাঁর গুণাবলি এবং চারিত্রিক পূর্ণতার প্রতি সম্যক অবগতি, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। কাজেই নবীজির অনুসরণের জন্য তাঁর গুণাবলি এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর দয়া এবং ইহসান আমাদের জানা আবশ্যক। আর এ অবগতি অর্জিত হবে সীরাত পাঠের দ্বারা।

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে নবীজির জীবনীর এই উত্তম আদর্শ এতটাই অনন্য এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, তা আর কোনো মানুষের জীবনীতে পাওয়া যায় না।

**সীরাতে নববীর বৈশিষ্ট্য**

এক. নবীজির জীবনচরিত ছিল ওহীভিত্তিক। কোরআনে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলেন না। এটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।' (সূরা নাজম- ৩, ৪)

দুই. অনুসরণীয় জীবনী, যা পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। তার জন্য চারটি গুণাবলি আবশ্যক :

১. সঠিক ও বিশুদ্ধ ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত হওয়া।

২. মানবজীবনের সর্বদিকের দিকনির্দেশনা ও অনুসৃত পন্থার বর্ণনা থাকা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আপত্তি মুক্ত হওয়া।

৪. কেবল নীতিকথা ও তত্ত্ব আলোচনাসমৃদ্ধ না হয়ে বাস্তব আমলের নমুনা থাকা।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে এমন এক মহান সীরাত দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, উপর্যুক্ত চারটি গুণাবলিই তাঁর জীবনচরিতের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

পূর্ণাঙ্গ, ত্রুটিমুক্ত ও বাস্তবসম্মত হওয়ার গুণাবলি অন্যান্য আম্বিয়া (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা এ সকল গুণাবলি দান করেছিলেন। নবীর জীবনী মানবসমাজের সব দিকের দিকনির্দেশনাপূর্ণ। যেখানে তিনি প্রত্যেক দাঈ, প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক বাবা, স্বামী, বন্ধু, মুরব্বি, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি সকলের জন্য উত্তম আদর্শ। এই সমন্বয় আগে-পরে কোনো ব্যক্তির মধ্যে আমরা পাইনি।

তিন. নবীজির জীবনের প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট। পিতা আব্দুল্লাহর সঙ্গে মাতা আমিনার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এমনকি হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত নবীজির পূর্বপুরুষের ক্রমধারাও সীরাতের কিতাবসমূহে বিবৃত হয়েছে। নবীজীবনের শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সব কাল ও সব অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ কারণে এই নশ্বর পৃথিবীতে একজন মানুষের ভাবনা, কল্পনা, কথা, সিদ্ধান্ত ও কর্মময় জীবন-সংসার কেমন হবে তার পূর্ণাঙ্গ, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও বিস্তৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে প্রিয় নবীজির জীবন পাতায়।

এ সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নবীজির জীবনী পাঠের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি নবীজির জীবনী পাঠের কিছু উপকারিতা উল্লেখ করা হচ্ছে।

**সীরাত পাঠের উপকারিতা**

১. নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত পাঠে কোরআন-সুন্নাহ বোঝা সহজতর হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দিয়ে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। তবে কোরআন সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তিনি নবীজি

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দায়িত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

অর্থ : আমি আপনার প্রতি কোরআন এজন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের জন্য তা খুলে খুলে বর্ণনা করেন। (সূরা নাহল-৪৪)

আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের দীর্ঘ নবুওয়াতি জীবনে কথাবার্তা, উঠাবসা, আচার-আচরণ, মৌন সমর্থন এবং চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে উম্মতের সামনে সেই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং নবীজির জীবনই কোরআন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

كان خلقه القران.

অর্থ : তাঁর জীবনই কোরআন। (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ২৫৩০২)

কোরআনে কারীমে অনেক আয়াত নবীজীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার অনেক আয়াতের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নে নবীজির কার্যত আমল এবং সাহাবায়ে কেরামকে কার্যত শিক্ষার মাধ্যমে কোরআনের আমলি তাফসীর সীরাত পাঠের দ্বারা উম্মাতের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে! সুতরাং কোরআন বোঝার জন্যও সীরাত পাঠ অপরিহার্য।

২. নবীজির সীরাত পাঠের দ্বারা নবীজির সত্যবাদিতার ওপর ঈমানের দৃঢ়তা লাভ হবে। কেননা আল্লাহর দ্বীনের জন্য এতটা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করা এবং স্বাভাবিক মানবসুলভ পথ ও পদ্ধতির অনুসরণে সমগ্র আরবের সহায়-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, হিংস্রতা-বর্বরতা, গোঁড়ামি ও হঠকারিতা, অধঃপতন ও চারিত্রিক বিপথগামিতার বিপরীতে ধাপে ধাপে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যাওয়ার এ ইতিহাস এ বিষয়টিই প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যই আল্লাহর নবী ছিলেন! কাজেই ঈমান বৃদ্ধির অনন্য নিয়ামক হলো 'নবীজির সীরাত'!

৩. সীরাত পাঠের দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হবে যে মুসলমানদের একটি সোনালি অতীত আছে। একটি সুন্দরতম, পরিপূর্ণ, সর্বজনীন ও বাস্তবসম্মত আদর্শ রয়েছে। যে আদর্শ কেবল পুঁথিগত বক্তব্য কিংবা নীতিগত ধারার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শত বছরের বিকৃত সংস্কৃতিমনা জাতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সফলতা ও অনুসৃত ব্যক্তিত্বে পরিণত করার পরীক্ষিত কষ্টিপাথর!

৪. সীরাত পাঠের অন্যতম একটি ফায়দা হলো যে এর মাধ্যমে যখন নবীজির সাথে মুহাব্বত এবং ভালোবাসা তৈরি হবে এবং এ মুহাব্বতের দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভ করতে পারবে। এ কারণেই কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী আপনি বলে দিন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৩১)

৬. সীরাত পাঠের আরো একটি ফায়দা হলো, নবীজি দ্বীনের জন্য যতটা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যখন আমরা জানতে পারব, তখন দ্বীনের জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হয়ে যাবে। কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কর্মতৎপরতায় উদ্যমতা এবং বিচক্ষণতা সৃষ্টি হবে।

৭. সীরাত পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো হাদীস ও সুন্নাতের মধ্যে যে সকল হুকুম-আহকাম রয়েছে, তার বিশদ ব্যাখ্যা নবীজির সীরাত পাঠের দ্বারা জানা যায় যে, এ হাদীসে উল্লিখিত আদেশটি কি ফরয, নাকি ওয়াজিব, নাকি সুন্নাত? তেমনি সুন্নাহে উল্লিখিত নিষেধটি কি হারাম, নাকি মাকরূহ নাকি অনুত্তম? ইত্যাদি বিষয়গুলো সীরাত পাঠের দ্বারা উম্মতের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়!

এ সকল উপকারিতার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন তাঁদের সন্তানদের নবীজীবনী অধ্যয়ন করানোর ব্যাপারে অনেক যত্নবান ছিলেন। হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা সন্তানদের যেভাবে কোরআন শিক্ষা দিতাম সেভাবেই রাসূলের জীবনী ও সমরাঙ্গনের ঘটনাগুলোও শিক্ষা দিতাম।" আর এ জন্যই রাসূলের জীবনী আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জন্যই অপরিহার্য।

**সীরাতের কিতাবসমূহ**

সব ভাষাতেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সীরাত রচিত হয়েছে। সীরাতের মৌলিক উৎসগ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় রচিত। তবে সর্বসাধারণের পাঠযোগ্য হিসেবে আমরা বাংলা ভাষায় অনূদিত কিংবা লিখিত কিছু গ্রন্থের নাম নিচে উল্লেখ করছি।

১. শামায়েলে তিরমিযী।

২. সীরাতে মুস্তফা–মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.)।

৩. নবীয়ে রহমত–মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)।

৪. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন

৫. ছোটদের সীরাত সিরিজ [ছোটদের জন্য]।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিকভাবে সীরাত অধ্যয়নের এবং তা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন।

# মাজলুম বাবরী মসজিদ : ইতিহাস ও নিদর্শনাবলির আয়নায়

**মূল : মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী আজমী**
সিনিয়র মুহাদ্দিস: দারুল উলূম দেওবন্দ
**অনুবাদ : মুফতী মাহমুদ হাসান**

**মসজিদ নির্মাণ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা :**
তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই প্রাচীন মসজিদটি বাদশাহ বাবরের শাসন আমলে অযোধ্যার গভর্নর মীর বাকী ইস্পাহানি ৯৩৫ হি. মোতাবেক ১৫২৮ ঈসায়ীতে নির্মাণ করেন। মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশ তিন কাতার ছিল। প্রত্যেক কাতারে প্রায় ১২০ জন মুসল্লি দাঁড়াতে পারতেন। আর চবুতরায় চার কাতারের জায়গা ছিল। এতে একই সঙ্গে মসজিদে সাড়ে ৮০০ মুসল্লি নামায আদায় করতে পারতেন।

মসজিদের মধ্যভাগে অবস্থিত সদর দরজার ওপরে ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ একটি শিলালিপি অঙ্কিত ছিল। শিলালিপির প্রথম লাইনে بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتی (পরম করুণাময় ও অতীব দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি, তাঁর ওপরই আমার সকল ভরসা) আকর্ষণীয় কারুকার্যের মাধ্যমে লিখিত ছিল। আর পরের তিন লাইনের মধ্যে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহ অঙ্কিত ছিল :

بنام آنکہ اودانائیا کبرکہ خالق جملہ عالم لامکانی
درود مصطفیٰ بعداز ستائش کہ سرورانبیاءزبدہ جہانی

অর্থ : ঊর্ধ্ব-অধঃ সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী আল্লাহর নামে সমগ্র জাহান থেকে সুনির্বাচিত সকল নবীর সর্দার মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদের হাদিয়া।

فسانہ درجہاں بابرقلندرکہ شددردورگیتی کامرانی
چنانکہ ہفت کشوردرگرفتہ زمیں راچوں مثال آسمانی

অর্থ : পৃথিবীর সর্বত্র সাধু বাবরের জগৎ-সংসারে সফলতার জয়গান, সপ্ত মুলুক অধিকৃত করে জমিনকে আসমানসম মর্যাদাবান করেছে।

درآں حضرت یکے میرمعظم کہ نامش میرباقی اصفہانی
مشیرسلطنت تدبیرملکش کہ ایں مسجدحصارہست بانی

অর্থ : এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে এক মহান আমির রয়েছেন মীর বাকী ইস্পাহানি নামে, যিনি রাজ্য পরিচালনায় পরামর্শদাতা ও সহযোগী, তিনিই হলেন এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা।

خدایادرجہاں تابندہ ماندکہ چتروتخت وبخت وزندگانی
دریں عہدودریں تاریخ میموں کہ نہ صدپنج وسی بودہ نشانی

অর্থ : হে আল্লাহ! পৃথিবীতে জ্যোতির্ময় থাকুক তাঁদের সিংহাসন, ছাউনি, ভাগ্য ও জীবন। এই কালে ও এই বরকতময় তারিখে, যা হলো ৯৩৫ সন তার স্থাপনকালের সাক্ষীস্বরূপ।

تمت ہذاالتوحیدونعت ومدح وصفت نوراللہ برہانہ
بخط عبدالضعیف نحیف فتح اللہ محمدغوری

অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের ও রাসূল (সা.)-এর প্রশংসাবাণীর বর্ণনা এবং বাদশাহ ও সভাসদের স্তুতিবাক্য সমাপ্ত হলো, আল্লাহ তাকে আলোকিত করুন।
অঙ্কনে : অক্ষম বান্দা ফাতহুল্লাহ মুহাম্মদ ঘুরী।

এই বড় শিলালিপি ব্যতীতও মসজিদের অভ্যন্তরে মিম্বারের উভয় পাশে দুটি শিলালিপি অঙ্কিত ছিল। ২৭ মার্চ ১৯৩৪ ইং সালের দাঙ্গার সময় যা গো-হত্যার প্রতিশোধের শিরোনামের বাহানায় ছাড়ানো হয়েছিল, তাতে দাঙ্গাবাজরা মসজিদে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর করে। তখন উক্ত শিলালিপি দুটিও চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে 'ঠিকাদার তাহুর খান' মিম্বারের বাঁ পাশের শিলালিপির অনুরূপ একটি অনুলিপি তৈরি করে সেখানেই স্থাপন করেন। আর ডান পাশের শিলালিপির একটি অনুলিপি সায়্যিদ বদরুল হাসান খায়রাবাদীর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এতে এই শিলালিপির লেখাটির বিবরণও পাওয়া যায়।

বাঁ পাশের শিলাখণ্ডে নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলো অঙ্কিত ছিল :

بفرمودہ شاہ بابرکہ عدلش بنائیست باکاخ گردوں ملاقی
بناکردایں مہبط قدسیاں راامیرسعادت نشاں میرباقی
بودخیرباقی وسال بنائش عیاں شدچوں گفتم بودخیرباقی

অর্থ : বাদশাহ বাবরের নির্দেশে যার ন্যায় ও সততার বালাখানা আকাশচুম্বী। এই পবিত্রাত্মাদের মিলনস্থল নির্মাণ করেছেন সৌভাগ্যশীল আমীর মীর বাকী। তাতে কল্যাণ অবধারিত থাকুক! তার নির্মাণের বছর সাংকেতিক হরফে প্রকাশিত হয় *بود خیر باقی*-এ বাক্যের মধ্যে।

ডান পাশের শিলাখণ্ডে অঙ্কিত পঙ্‌ক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

بمنشائے بابرخدیوجہاں بنائے کہ باکاخ گردوعناں
بناکردایں خانہ پائیدارامیرسعادت نشاں میرخاں
بماندہمیشہ چنیں بانیش چناں شہریارزمیں وزماں

অর্থ : সম্রাট বাবরের ইচ্ছানুসারে যার বালাখানার চারপাশ ও লাগামের সাথে পৃথিবী সম্পৃক্ত। এই মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী ঘরটি স্থাপন করেছেন সৌভাগ্যের নিদর্শন আমির (বাকী) খান। তাঁর স্থাপনাকারী অমর হোক, তদ্রুপ এই জনবসতি ও কালের সম্রাটও অমর হোক!

নির্মাণের শুরু থেকেই বাবরী মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায আদায় হচ্ছিল। আদালতি কাগজপত্রের দ্বারা জানা যায় যে, নিকট অতীতে তথা ১৮৫৮ থেকে ১৮৭০ ইং সাল পর্যন্ত এই

মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মৌলবী মুহাম্মদ আসগর। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ ইং সাল পর্যন্ত মৌলবী আব্দুর রশীদ ইমাম ও খতীব ছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯৩০ ইং সাল পর্যন্ত ইমামত ও খেতাবতের খিদমতে রত ছিলেন মৌলবী আব্দুল কাদের। আর ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ ইং সালে মসজিদ ক্রোক হওয়ার দুর্ঘটনা পর্যন্ত মৌলবী আব্দুল গাফ্ফারের পেছনে মুসলিমগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ আদায় করতেন।

বাবরী মসজিদের ব্যয়ভারের জন্য মোগল আমলে শাহি কোষাগার থেকে বার্ষিক ৬০ রুপি বরাদ্দ ছিল। অযোধ্যার নবাবদের যুগে এসে এই বাজেট ৩০২ রুপি ৩ আনায় উন্নীত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনামলেও এই বরাদ্দ বহাল ছিল। পরবর্তীতে তার জন্য নগদ বরাদ্দের পরিবর্তে প্রথমবার দুটি গ্রাম তথা ভূরণপুর ও শোলাপুর গ্রামদ্বয় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

মোটকথা, তার ভিত্তিপ্রস্তর ও স্থাপনের প্রথম দিন ৯৩৫ হি. মোতাবেক ১৫২৮ ইং সাল থেকে নিয়ে ১৩৬৯ হি.

মোতাবেক ১৯৪৯ ইং পর্যন্ত এই মসজিদটি কোনো ধরনের বিবাদ ও বিভেদ ব্যতীত মসজিদ হিসেবেই মুসলিমদের একটি সম্মানিত ইবাদতখানা হিসেবেই ছিল। আর তাতে মুসলিমগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত নিজেদের ধর্মীয় ইবাদত করছিল।

**মসজিদ-মন্দির বিবাদের সূত্রপাত :**

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, বাবরী মসজিদ নির্মাণের শত শত বছর পূর্ব থেকেই মুসলমানগণ অযোধ্যায় বসবাসরত ছিলেন। আর এখানকার হিন্দু-মুসলিম বিবাদহীন একসঙ্গে বসবাস করছিল। ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮৫৫ ইং সালের পূর্বে কোনো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের মাঝে কোনো প্রকারের বিবাদ হয়েছে বলে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বা ধর্মীয় লেখকদের থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যখন এই উপমহাদেশে ইংরেজদের অশুভ ছায়া পড়েছে এবং এ দেশে যখন তাদের দখলদারিত্ব শুরু হলো, তখন তারা তাদের কলঙ্কজনক পলিসি Divide and rule (পরস্পরে বিবাদ লাগাও এবং শাসন করো)-এর মাধ্যমে এখানকার জনগণের মাঝে পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ-মন্দির ও জন্মস্থান ইত্যাদির ন্যায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ছুড়ে দিল। যার ফলে ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮৫৫ ইং সালে অযোধ্যায় মারাত্মক রক্তপাত হয়। তখন থেকেই মূলত বিভেদের দূরত্ব প্রশস্ত হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত এখানে এসে গড়াল।

দাবাড়ু ইংরেজরাই সর্বপ্রথম 'জন্মস্থান' ও 'সীতার রসুইঘর'-এর কাল্পনিক কাহিনির জন্ম দেয়। এতে এই দুটি জায়গার সন্ধান বের করে এক বৌদ্ধ জ্যোতিষীকে পূর্ব থেকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে আনা হয়। সে পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে দাগ টেনে বাতলিয়ে দিল যে, 'জন্মস্থান' ও 'সীতার রসুইঘর' বাবরী মসজিদের সাথে লাগোয়া চবুতরার ভেতরে। অতঃপর তার ভক্ত হিন্দুদের উস্কানি দিল যে তোমরা এই দুই পবিত্র স্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করো। নকী আলী খান যে নবাব ওয়াজেদ আলীর শ্বশুর ও উজির ছিল, সে ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রের সমর্থক ছিল। সে নিজের প্রভাবের মাধ্যমে অপরিণামদর্শী নবাবকে এ কথার ওপর রাজি করিয়ে ফেলল যে, বাবরী মসজিদের মূল অংশের বাইরে তবে চৌহদ্দির ভেতরে জন্মস্থান ও সীতার রসুইঘরের জন্য জায়গা দিয়ে দেওয়া হোক। একপর্যায়ে মসজিদের ছাদবিশিষ্ট অংশের সাথে লাগোয়া খোলা বারান্দার ডান পাশের অংশ সীতার রসুইঘরের জন্য এবং বাঁ পাশে বারান্দার পরবর্তী পূর্ব পাশের অংশে জন্মস্থানের নামে ২১×১৭ ফুট জায়গা দিয়ে দেওয়া হলো। যাতে ওই সময় থেকেই পূজা পাট শুরু করে দেওয়া হয়।

অথচ যে সময় এই কল্পকাহিনির সূত্রপাত, তার বহু বছর পূর্ব থেকেই শহরের প্রাণকেন্দ্রেই জন্মস্থানের মন্দির তৈরি ছিল এবং এখনও আছে। সে সময়ই মসজিদ ও জন্মস্থানের মাঝে সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মসজিদের বারান্দার চারপাশে লোহার পরিবেষ্টন দিয়ে দেওয়া হলো, এই অশুভ ইতিহাস থেকেই অযোধ্যায় ধর্মীয় টানাপড়েন শুরু হয় এবং এখানকার হিন্দু-মুসলিম, মন্দির-মসজিদের নামে পরস্পরে কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

১৮৫৭ ইং সালে যখন হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলিম আপসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাহাদুর শাহ্ যফরের নেতৃত্বে ইংরেজবিরোধী আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। তখন ফয়েজাবাদ জেলার গেজেটরের মাধ্যমে জানা যায় যে, ওই সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অযোধ্যার মুসলিম লিডার 'আমীর আলী' এবং হিন্দু লিডার 'বাবা চরণদাস' উভয়ে রাম জন্মভূমি ও বাবরী মসজিদ বিবাদকে স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য একটি চুক্তি করেন। চুক্তিটি হলো যে, রাম জন্মস্থানের জন্য নির্দিষ্ট বিবাদমূলক জায়গাটি হিন্দুদের সোপর্দ করে দেওয়া হবে এবং হিন্দুরা বাবরী মসজিদের মূল অংশ থেকে তারা দাবি উঠিয়ে নেবে। এই চুক্তির ওপর উভয় পক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং দুই বছর যাবৎ যে কলহ-বিবাদের অগ্নি উৎসারিত হচ্ছিল তা নিভে গেল। কিন্তু নরাধম ইংরেজদের হিন্দু-মুসলিমের এই ঐক্য পছন্দ হয়নি। তারা বাবা রাম চরণদাস ও আমীর আলী উভয়কে একসাথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। আর মসজিদ-মন্দির দ্বন্দ্বকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে বিভেদসম্পন্ন রাম জন্মস্থান ও বাবরী মসজিদের মাঝে দেয়াল টেনে দিয়ে উভয়টির রাস্তা ভিন্ন

করে দেয় এবং মসজিদের উত্তর দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অতঃপর কট্টরপন্থী হিন্দুদের উস্কানি দিল যেন তারা এই বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে পুরো মসজিদ যেন নিজেরা দাবি করে। আর মুসলিমদেরকেও তারা এ কথার ওপর উদ্বুদ্ধ করে যেন তারা মসজিদের মালিকানাধীন জমির কোনো অংশ ছাড়তে রাজি না হয়। এতে পুনরায় উভয় ধর্মীয়দের মাঝে টানাপড়েন আরম্ভ হয়, যা দীর্ঘাতি দীর্ঘ হতে থাকে।

**মসজিদকে মন্দির বানানোর লজ্জাজনক ষড়যন্ত্র :**

১৯৪৮-৪৯ ইং সালে যখন হিন্দুস্তান সাম্প্রদায়িক উগ্রতার আগুনে জ্বলছিল এবং পুরো হিন্দুস্তানে সীমালঙ্ঘন ছড়িয়ে পড়ছিল, ২২-২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ ইং সালের মধ্যরাতে হনুমানগড়ের সন্ন্যাসী আভে রাম দাস নিজের কিছু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে মসজিদে অনুপ্রবেশ করে মেহরাবের মধ্যে এটি মূর্তি রেখে দিল। সে সময়কার নিরাপত্তারক্ষী পুলিশ 'মাতু প্রসাদ' এ জন্য তার বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেন এবং নিম্নের অভিযোগ পেশ করেন :

"আভে রাম দাস, শুদ্রশেন দাস ও ৫০ জন অজ্ঞাত লোক মসজিদে মূর্তি স্থাপন করে মসজিদকে নাপাক করে দিয়েছে, এতে এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়ে গিয়েছে।"

উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ফয়েজাবাদের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৪৫ ধারা অনুসারে মসজিদ ও তার সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রিয় দত্তরাম চেয়ারম্যানকে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। আর উভয় পক্ষকে নোটিশ দেওয়া হলো, নিজ নিজ দাবির প্রমাণ হাজির করার জন্য। সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের এই অন্যায় আচরণ প্রমাণ করে যে মসজিদে মূর্তি স্থাপনের এই অপকর্ম গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। নচেৎ সাড়ে ৫০০ বছরের পুরাতন জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা জামাতের দ্বারা আবাদ একটি মসজিদের ব্যাপারে প্রমাণ চাওয়ার কী অর্থ? এখানে সোজা কথা ছিল, মাতু প্রসাদের রিপোর্ট অনুসারে আসামিদের বিচার হবে এবং মসজিদ থেকে মূর্তি সরিয়ে ফেলবে, এতেই বিচার শেষ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়– হযরত শায়খুল ইসলাম মাও. হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) মাও. আবুল কালাম আজাদ (রহ.) ও মাও. হিফজুর রহমান সিউহারবি (রহ.) তাৎক্ষণিক পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুকে বিষয়টির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ইউপির মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পণ্ডিতকে এই বিবাদ নিরসনের তাৎক্ষণিক আদেশ দেন। কিন্তু এতেও ইতিবাচক কোনো কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়নি এবং উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আইন ও ইনসাফের ওপর জোরপূর্বক জয়ী হলো। যেন হিন্দুস্তানের আজাদী যুদ্ধে মুসলমানদের অসামান্য আত্মত্যাগের প্রথম উপহার ক্ষমতাবান হিন্দু সম্প্রদায় এভাবে দিল যে, মুসলিমদের প্রাচীন বরকতময় ইবাদতের স্থানে মূর্তি স্থাপন করে দেওয়া হলো এবং তার মিম্বর ও মেহরাব, যা রুকু-সিজদা দ্বারা আবাদ ছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো।

**অশুভ শুরুর শেষ পরিণাম :**

এই ট্র্যাজেডির পরেই মাওলানা আজাদ (রহ.) বলেছিলেন, "আমার মনে এই প্রশ্ন গুঞ্জরিত হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে মুসলিমদেরকে একটি জাতি হিসেবে হিন্দুস্তানে মেনে নেওয়া হবে কি না? যদি তার জবাব ইতিবাচক হয়, তাহলে বাবরী মসজিদ থেকে মূর্তি অপসারণ করা হবে। আর যদি জবাব নেতিবাচক হয়, তাহলে অপেক্ষা করুন! অন্যান্য মসজিদও এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে।"

আহ! আজকে ঘটনাপ্রবাহ মাওলানা আজাদের এই আশংকাকে সঠিক প্রমাণিত করে। এই দুর্ঘটনার পর ১৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ইং তারিখে গোপাল সিং নামক এক লোক জহুর আহমদ, হাজী মোহাম্মদ ফায়েক, হাজী ফেকু, আহমদ হাসান, মোহাম্মদ সামী ও ডি এম সিটি ম্যাজিস্ট্রেট ও উত্তর প্রদেশ সরকারকে বিবাদী বানিয়ে এ দাবি দায়ের করে যে বাবরী মসজিদের মূল অংশই রামের জন্মস্থান। আমরা এখানে পূজা পাট করতে চাই, তবে মুসলিমরা ও জেলা প্রশাসক আমাদেরকে বাধা দেয়। অতএব শীঘ্রই এই বাধা উঠিয়ে হিন্দুদের পূজা পাটের জন্য নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি দেওয়া হোক।

এই মোকাদ্দমা দায়ের করার তৃতীয় দিনই ১৯ জানুয়ারি ১৯৫০ ইং তারিখে আদালত একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে হিন্দু-মুসলিম উভয় দলকেই মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অতঃপর ১৩ মার্চ ১৯৫১ ইং তারিখে আদালত পূজারিদের মসজিদের ভেতর পূজা-ভোগ করার অনুমতি দিয়ে দিল। কিন্তু মুসলিমরা স্বীয় ইবাদতখানায় এক আল্লাহর ইবাদত করা থেকে মাহরূম হয়ে গেল।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে যখন জুলুম ও অন্যায়ের পক্ষে হুকুমত ও শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা থাকে, তখন আইন-আদালত সব অন্যায়ের সামনে নতজানু হয়ে যায়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাবরী মসজিদ মামলা। উক্ত দাবির বিরুদ্ধে ফয়েজাবাদের এসপি কর্নসিং ১ জুন ১৯৫০ ইং তারিখে জবাবি দাবি আদালতে পেশ করেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন :

"প্রাচীন যুগ থেকেই বাবরী মসজিদ মসজিদ হিসেবেই চলে আসছে, তাতে সর্বদা মুসলিমগণ নামায পড়ে আসছেন,

এর সাথে হিন্দুদের কোনো সম্পর্ক নেই।"

ফয়েজাবাদের ডেপুটি কমিশনার এই মোকাদ্দমার ব্যাপারে ১ জুলাই ১৯৫০ ইং তারিখে যে হলফনামা দাখিল করেছিল, তাতেও বাবরী মসজিদের মসজিদ হিসেবে হওয়ার স্বীকার করা হয়েছিল।

উপরোক্ত দুই মামলা ব্যতীতও ১৯৬১ ইং সালেও দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। একটি রামচন্দ্র দাসের পক্ষ থেকে, অন্যটি নরমুহী অখড়ার পক্ষ থেকে। যার জবাবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও ইউপি সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াক্ফ বোর্ডের পক্ষ থেকেও মোকাদ্দমা দায়ের করানো হয়েছিল। যার মধ্যে দাবি করা হয়েছিল যে, এই বাবরী মসজিদ মুসলিমদের মসজিদ, যার মধ্যে তারা ১৫২৮ ইং সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইবাদত করে আসছে। অতএব তাদেরকে এই মসজিদ ফেরত দেওয়া হোক।

প্রায় ৩৫ বছরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই মোকাদ্দমাগুলো আদালতে নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়েছিল। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে পুলিশ ও রক্ষী বাহিনীর হেফাজতেও মসজিদের ভেতরে-বাইরে অন্যায়ভাবে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন : মসজিদের শাহি দরজায় বড় হরফে 'আল্লাহ' নাম খোদাইকৃত ছিল, যা উপড়ে ফেলা হয়েছে। সদর দরজায় রাম জন্ম স্থাপনের সাইনবোর্ড এঁটে দেওয়া হয়। মসজিদের আঙিনার উত্তর সীমানাপ্রাচীরের ভেতর এবং মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে কালো মর্মর পাথরের মেঝে তৈরি করে 'পরীকর্মা' নাম দেওয়া হয়। আঙিনার উত্তর পাশে হ্যান্ডপাইপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদের বাইরে পূর্ব দিকে একটি মন্দির ও পূজারিদের জন্য একটি কক্ষ তৈরি করা হয়। দক্ষিণ পাশে বানোয়াট জন্মস্থানেও একটি মন্দির তৈরি করে ফেলা হয়। মসজিদের মধ্যবর্তী গম্বুজের ওপর ভগবতী নিশান লাগিয়ে দেওয়া হয়। এসব পরিবর্তন ১৯৬৭ ও ১৯৮৬ ইং সালের মাঝামাঝিতে করা হয়। অথচ এগুলো দেখেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, আদালত ও প্রশাসনের কপালে কোনো ভাঁজও পড়েনি।

**হুকুমতের চাপে আদালত মসজিদে মূর্তিপূজার অন্যায় অনুমতি প্রদান :**

মুসলিমদের একপর্যায়ের আশ্বস্ততা ছিল যে মসজিদ তালাবদ্ধ রয়েছে এবং হাইকোর্টে মামলার শুনানি চলছে। আদালত এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দেবে তা মেনে নেওয়া হবে। কেননা তখন পর্যন্ত আদালতের ওপর তাদের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়নি। এমনকি এক শান্ত পরিবেশে ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৬ ইং-এ রমিশ পাণ্ডে নামক জনৈক ব্যক্তি যার সাথে বাবরী মসজিদ সম্পর্কিত মামলাগুলোর কোনোটির সাথে সম্পর্ক ছিল না সে হঠাৎ ফয়জাবাদে নিম্ন আদালত বরাবর এ আবেদন দায়ের করে,

"রামের জন্মস্থানে পূজা পাটের অনুমতি হওয়া উচিত। এজন্য আদালত জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিক যে, জন্মভূমি বাবরী মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হোক। যাতে আমি ও অন্য হিন্দুরা কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়া পূজা করতে পারে।"

জেলা নিম্ন আদালত এ বলে আবেদন নাকচ করে দেয় যে, "এই মামলার মূল ফাইল হাইকোর্টে শুনানি চলছে, তাই এ আবেদনের ওপর কোনো রায় দেওয়া যাবে না।"

নিম্ন আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে মি. কে এম পাণ্ডে জেলা জর্জ কোর্টে আপিল করে। জেলা জর্জ কোর্টে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ ইং তারিখে পৌনে ১২টায় এই একতরফা রায় শুনিয়ে দেয় যে, "জেলা প্রশাসক মসজিদের তালা খুলে দেবে এবং রমিশ পাণ্ডেসহ অন্য পূজারিদের ব্যাপকভাবে অনুমতি দেওয়া হোক, এতে কোনো প্রকারে বাধা না দেওয়া হোক এবং জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট আইন ও রায়ের কার্যকারিতার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

এই অন্যায় বিচারের রায়ের পরপরই কাল বিলম্ব না করে বিকাল ৫টা ১৯ মিনিটে বাবরী মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হয়, যে তালা ১৯৫০ ইং সালের নিষেধাজ্ঞা জারির সময় লাগানো হয়েছিল। আর দ্রুতগতিতে হাজার হাজার হিন্দু সেখানে একত্রিত করে মসজিদে পূজা পাট শুরু করে। তালা খোলার এই নিলর্জ্জ অনুষ্ঠান সেক্যুলার দেশ হিন্দুস্তানের মিডিয়া 'দূরদর্শন' খুব গুরুত্ব ও আমেজের সহিত প্রচার করে। যাতে মুসলিমদের অন্তরের কাটা ঘায়ে ভালোভাবে নুন ছিটা দেওয়া যায়। তা ছাড়া সমগ্র দেশে এর উৎসব পালন করা হয়। আর এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে মুসলিমদেরকে পরাজিত করা হয়েছে। এই প্রকাশ্য ন্যায়বহির্ভূত রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ প্রতিবাদ জানালে প্রতিবাদকারীদেরকে রাইফেলের গুলি দ্বারা চিরতরে খামুশ করে দেওয়া হয়। বিশেষত বারাবাংকী, বেনারস, বেঙ্গালুর প্রমুখ শহরে পুলিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হৃদয়বিদারক হিংস্রতা ও পশুত্বের আচরণ করে। পরবর্তীতে এ কথাও ছড়ায় যে সেক্যুলারিজমের পতাকাবাহী কংগ্রেস হুকুমতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ইশারায়ই তালা খোলা হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এই জনশ্রুতি ভিত্তিহীন ছিল না। আর বাস্তবও তাই, যেকোনো মজবুত রাজনৈতিক সাপোর্ট ব্যতীত আদালতের ন্যায়বিচারের পোশাক এরূপ নিলর্জ্জভাবে ছিন্ন করার দুঃসাহস হতো না।

**মসজিদ ধ্বংস করে রাম মন্দির স্থাপনের অন্যায় ঘোষণা ও প্রস্তুতি :**

মসজিদে পূজা পাটের সাধারণ অনুমতি লাভের পর উগ্রবাদী হিন্দুদের সাহস বেড়ে গেল। এখন আরো এক কদম আগে বেড়ে মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের উগ্র প্রচেষ্টা শুরু হলো। হুকুমতের না জানার ভান ধরা এবং দ্বিমুখী নীতির কারণে তাতে আরো শক্তি জুগিয়েছে। একপর্যায়ে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র নেতা অশোক শিংঘল হুমকির সুরে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় যে, ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ ইং তারিখে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। আর দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের এই দুঃসাহস নেই যে আমাদের এই প্রোগ্রামকে রুখে দেবে। সাধারণ হিন্দুদেরকেও পক্ষে আনার জন্য প্রোগ্রাম এভাবে বানানো হয়েছিল যে, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ভিত্তিপ্রস্তরের ইট পূজা আরম্ভ হবে। এতে সারা হিন্দুস্তানের ৫ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গ্রামে একেকটি ইট পাঠিয়ে তার পূজা করানো হবে। ৯ নভেম্বর এ সকল ইট অযোধ্যায় পৌঁছানো হবে এবং ওই দিনই রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি উগ্র আক্রমণাত্মক সংস্থাগুলো নিজ নিজ নেতাদের ঘোষণা অনুসারে ইট পূজার নামে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নিন্দা ও উগ্রবাদের বিষ ছড়াচ্ছিল। আর ইন্ডিয়ার সেক্যুলার হুকুমত মৌনতার দ্বারা তাদের সহযোগিতা করছিল। শেষ পর্যন্ত এমনও হলো যে কংগ্রেস হুকুমতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দিষ্ট তারিখ তথা ৯ নভেম্বরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাতে বিতর্কিত জমিতে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুমতি দিয়ে মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, বাবরী মসজিদের ধ্বংস ও রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনক বিভ্রান্তিমূলক পলিসি অবলম্বন করলেন। একদিকে এ ঘোষণা করছিলেন যে বিতর্কিত জায়গায় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে না। আর পর্দার আড়ালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাথে শলা-পরামর্শও করছিল। হুকুমতের এই কপট পলিসি কট্টর সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলোকে এ পরিমাণ দুঃসাহসী বানিয়ে দিল যে, ২৩ জনু ১৯৯০ ইং-এ হরিদারে হিন্দু নেতারা এক কদম অগ্রসর হয়ে এ কর্মসূচিও ঘোষণা করল যে, আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে জায়গায় জায়গায় থেকে র‍্যালি বের করা হবে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে মন্দির নির্মাণের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করা হবে। আর ৩০ অক্টোবরে মসজিদের জায়গায় রাম মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরএসএস, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও তাদের সমমনা সকল উগ্র সাম্প্রদায়িক দল মাঠে নেমে পড়ে। বিজেপির চেয়ারম্যান লালকৃষ্ণ আদভানি সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা শুরু করে। এই রথযাত্রায় সীমাহীন উস্কানি ও উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করা হয়। যার পরিণতিতে বাড়োদা, ভেলর, কর্ণাটক, মুধিয়া প্রদেশ ও ইউপির কোনো কোনো জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু সরকার যার প্রধান ও প্রথম দায়িত্বই হচ্ছে নিজ দেশের নাগরিকদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দেওয়া, তারা নিজেদের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও নিজের জান বাঁচানোর চিন্তায় বিভোর ছিল। আর লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞের দৈত্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আগুন ও রক্তের তুফান বইয়ে দিচ্ছিল।

অতঃপর ঘোষণা অনুসারে ৩০ অক্টোবর ১৯৯০ ইং-এ স্বেচ্ছাসেবকদের বিশাল বহর অযোধ্যায় পৌঁছে গেল এবং বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার জন্য নিজের মতো করে চেষ্টাও করেছিল। এমনকি মসজিদের দেয়াল ও গম্বুজকে আঘাতও করেছিল। তবে ইউপির মুখ্যমন্ত্রীর কঠিন পদক্ষেপের কারণে তারা তাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সফল হতে পারেনি। আর সত্য এটিই যে, এই সময় মুখ্যমন্ত্রী মোলায়েম সিং জাদব যে প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং নিজের জান বাজি রেখে শুধু বাবরী মসজিদকেই বাঁচাননি বরং সেক্যুলার ও গণতন্ত্রের ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। রাম ভগবত ও স্বেচ্ছাসেবীর নামে যে অযোধ্যায় একত্রীকরণ হয়েছে, যখন তা বিফল হয়, তখন তারা নিজেদের ক্ষোভ মুসলিমদের ওপর ঝেড়েছিল এবং পিএসির সাহায্য-সহযোগিতায় দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যাতে হাজারো মুসলিমকে শহীদ করা হয়। আর লক্ষাধিক মুসলিমের সহায়-সম্পত্তি লুট করে নেয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

বিপি সিং যে বিজেপির সাথে ঐক্যের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে সে নিজের ক্ষমতা রক্ষায় কপটতার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তার এই কাপুরুষতার আচারণ তার গদিকে রক্ষা করতে পারেনি। সহিংসতার আগুন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে তাকেও জ্বালিয়ে ভস্ম করে ছাড়ে। বিপি সিংয়ের ক্ষমতা শেষ হওয়ার পর চন্দ্র শিখর ক্ষমতায় আরোহণ করলেন। তিনি এসে এ কাজ করলেন যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তার সমমনা দলগুলোকে (যারা প্রথম দিন থেইে কট্টরপন্থী মত অবলম্বন করে কেবল আলাপ-আলোচনার পথই বন্ধ করে রাখেনি, বরং আদালতের রায়ও মানার জন্য তৈয়ার ছিল না) আলাপ-আলোচনার ওপর রাজি করে ফেলল। এতে ওই পার্টিগুলোর সাথে বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির নেতাদের মাঝে সরাসরি আলোচনার ধারাবাহিকতা শুরু হলো। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবির প্রমাণে লিখিত দলিলাদি পেশ করে। আলোচনার ধারাবাহিকতা শেষ না হতেই চন্দ্র শিখরের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। পরিশেষে দেশে নির্বাচন

হলো। ফলে কালয়ান সিংয়ের নেতৃত্বে ইউপিতে বিজেপি ক্ষমতায় এল, আর কেন্দ্রে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারী কংগ্রেস নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে ক্ষমতায় বসল।

**বাবরী মসজিদের হৃদয়বিদারক নির্মম শাহাদাত :**

বিজেপি তাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার কারণে সব সময়ই বাবরী মসজিদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছিল এবং তাকে গোলামির চিহ্ন হিসেবে গণ্য করছিল। এখন তো রাজ্যে তাদের হুকুমত ছিল। তাই এটা তারা কিভাবে বরদাশত করবে। অতএব বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কালয়ান সিং মন্ত্রিসভা গঠনের পরই সর্বপ্রথম যে কাজ করল, তা হচ্ছে নিজের মন্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে অযোধ্যায় এল এবং বাবরী মসজিদের মধ্যে স্থাপনকৃত মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে এই পণ করল যে, "রাম! আমরা আসব এবং এখানেই মন্দির বানাব।" এই অঙ্গীকারের পর কালয়ান সিং হুকুমত আইন-আদালতকে ছুড়ে ফেলে রাম মন্দির তৈরির পথে সকল বাধা দূর করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। বাবরী মসজিদের সংলগ্ন ওয়াক্‌ফকৃত বিতর্কিত জায়গা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিল। অতঃপর তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাতে সোপর্দ করে, যাতে শক্ত ভিত্তির সাথে মজুবত চবুতরার নির্মাণকাজ খুব জোরেশোরে শুরু হলো। অথচ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল যে, বিতর্কিত জায়গায় কোনো প্রকারের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। আদালত অবমাননা করে নির্মাণকাজ চলতে থাকে। আর মুসলিম নেতারা এই অন্যায় পদক্ষেপের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারে কাছে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল না, যতক্ষণ না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিজের অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ছাড়ল। চবুতরা নির্মাণের পর প্রধানমন্ত্রী নতুন সূত্রে উভয় পক্ষে আলোচনার ধারাবাহিকতা শুরু করালেন, যা কিছুদিন পর্যন্ত মোটামুটি আস্থা ও আশার বাণী শুনিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একতরফা ঘোষণা করে দিল যে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং-এ রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। জানা কথা যে, এই ঘোষণার পর আলোচনার কী সুযোগ থাকবে। ফলে আলোচনার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উগ্র সাম্প্রদায়িক দলগুলো নড়েচড়ে উঠল। বিজেপির সাবেক প্রধান আদভানি যাত্রায় বের হয়ে যায়। অন্য সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দলগুলোও অযোধ্যায় একত্রিত হতে লাগল। আর দেখতে দেখতে সমগ্র দেশের পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে গেল।

ইউপির মুখ্যমন্ত্রী কালয়ান সিং আদালত ও হুকুমতকে মজবুত অঙ্গীকার দেয় যে, এ নির্মাণ শুধু কৃত্রিম হবে এবং আদালত ও হুকুমতের বিন্দুমাত্র হুকুম অমান্য করা হবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করছিল যে, বাবরী মসজিদের সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্যুলারিজমের বুলি আওড়ানো প্রধানমন্ত্রীও ঘোষণার পর ঘোষণা দিচ্ছে যে, বাবরী মসজিদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব হুকুমতের। কেন্দ্র থেকে বিশাল সৈন্য বাহিনী অযোধ্যায় পৌঁছে গেছে। তবে তাদেরকে অজানা কারণে বাবরী মসজিদস্থল থেকে দুই-আড়াই কিলোমিটার দূরে রেখে দেওয়া হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মসজিদের সংরক্ষণের জন্য তার চারপাশে বেষ্টনকৃত ছিল। তবে তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ ছিল যেন তারা রামভক্তদের প্রতি কোনো অবস্থাতেই গুলি না চালায়।

মোটকথা, এ সকল ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনার নাটকের ছত্রচ্ছায়ায় ৬ ডিসেম্বরের ভয়ংকর তারিখ এসে পড়ল। আদভানি, সিংহল ও ওমা ভারতী প্রমুখ ২ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অযোধ্যার ময়দানে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। এসব নেতার দিকনির্দেশনায়ই কাজ শুরু হলো। উগ্রতায় উস্কানি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দল বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে বাবরী মসজিদের ওপর তুফান উঠিয়ে দিল। আর কোনো প্রকারের বাধা-বিপত্তিহীন পূর্ণ এতমিনানের সাথে ৪টা পর্যন্ত মসজিদ ভাঙা ও তার ভগ্নাংশ দূরে নিক্ষেপের কাজে রত ছিল। একপর্যায়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে বাবরী মসজিদের নাম-নিশানাও নিশ্চিহ্ন করে দিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে একেক মিনিটের সংবাদ পৌঁছেছিল। কিন্তু মসজিদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা না বাস্তবায়িত হলো, না তার সংরক্ষণের দায়িত্ব আদায় করা হলো। এভাবেই ২২-২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ ইং সালে বাবরী মসজিদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং সালে সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছল।

মুখ্যমন্ত্রী কালয়ান সিংয়ের প্ল্যান যেহেতু বাস্তবায়িত হলো, এজন্য সে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াল। ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে চলে আসে। তা সত্ত্বেও প্রায় পরবর্তী ৩৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অযোধ্যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ছিল। তারা ওই সময় অযোধ্যার আরো অনেক মসজিদকেও মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, অথবা ভেঙেচুরে অব্যবহারযোগ্য বানিয়ে দেয়। আর অযোধ্যায় বসবাসরত মুসলিম বসতিগুলোকে তছনছ করে দেয়। ইতিমধ্যেই বাবরী মসজিদের জায়গায় তাঁবু গেড়ে মূর্তি স্থাপন করে পূজা পাটও শুরু করে দেওয়া হয়। রামভক্তরা যখন

নিজেদের রামভক্তির সকল কর্মকাণ্ড থেকে এতমিনানের সাথে অবসর হলো, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় স্বসম্মানে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবমূর্তির ওপর এটা এমন এক হামলা ছিল, যার ব্যথা ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে তারা যখন আহ্ করে উঠল, তখন এই মজলুমদের অসহায় আহ্ শব্দটিও আমাদের সেক্যুলার হুকুমতের বরদাশত হয়নি। উহ্-আহ্ শব্দ বলার অপরাধে হাজারো মুসলমানকে রক্তের বন্যা ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

আজ কোনো হুকুমতই আছে, যারা মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা খেলছে না। কোনো শহর এমন আছে, যার আবহাওয়া এতিম শিশুদের আহাজারি ও বিধবাদের শোক-মাতমে বিপর্যস্ত হয়নি। গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের দাবিদার দেশ এবং সেক্যুলার পার্টির শাসনামলে মুসলিমদের ওপর এরূপ অমানবিক পশুত্বের আচরণ করা হলো, যারা হিন্দুস্তানের আজাদীর জন্য সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করল। এটি কত বড় লজ্জাজনক আফসোসের কথা! এই মুসলিমরা আর কতদিন এভাবে এই দেশের জন্য খুন ও ইজ্জতের বলিদান করবে?

সব কিছু লুটে যাওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা আসে যে, মুসলমানদের নিরাপত্তার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীও ঘোষণা করেছেন যে, বাবরী মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করানো হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়নি, মুম্বাইতে মুসলিমদের ওপর শিবসেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাজারো মুসলিম তাদের হাতে নিহত হয়। লক্ষাধিক মুসলিমের সহায়-সম্পত্তি লুট করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শিবসেনাদের এই হিংস্র হায়েনাগুলো হিংস্রতা করছিল, আর ভারতের হুকুমত বসে বসে দেখছিল। যখন মুসলিমদের রক্তের বন্যা বইয়ে সর্বশেষ তাদের রক্তপিপাসা নিবারণ হলো, তখন গিয়ে তাদের এই হিংস্রতার নগ্ন নাচ বন্ধ হলো। আর বাকি রইল, বাবরী মসজিদের নির্মাণের বিষয়। তো যে হুকুমত পুরাতন নির্মাণের নিরাপত্তা দিতে পারেনি, তাদের কাছে নতুন মসজিদ নির্মাণের আশা রাখা নিজের সাথে নিজে প্রতারণার শামিল। এই সময় হুকুমত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার ছিল। একদিকে ন্যায়-ইনসাফের চাহিদা, তো অপরদিকে ভোট ও ক্ষমতার গদির চিন্তা। এজন্য কখনো ব্যাকুল হয়ে অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নেয়। আবার কখনো আদালতে ধর্ণা দেয়।

**এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় :**

বাবরী মসজিদের ইতিহাসের এই সপ্তম পর্যায়ও দেখতে দেখতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং-এ পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাবরী মসজিদ ও রাম জন্মস্থানের মালিকানার অধিকারসংক্রান্ত মামলার ৬০ বছরে দীর্ঘ অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দিয়ে দিল। তাতে বলা হলো, "বিতর্কিত জায়গা তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক। এক-তৃতীয়াংশ মন্দির, এক-তৃতীয়াংশ মসজিদ এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ নির্মোহী আখড়াকে।'

এই রায়ে বিজেপি আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং কংগ্রেস স্বস্তি প্রকাশ করেছে। বরং কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি তো দাবিই করে বসল যে, "এই মামলার এর চেয়ে উত্তম রায় হতেই পারে না।" তাই এ ক্ষেত্রে শুধু কাকতালীয় ঘটনা বলে এই বাস্তবতাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না যে, বাবরী মসজিদ বিবাদের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মোড় এসেছিল, অথবা অন্য কথায় বাবরী মসজিদের ওপর বিভিন্ন সময়ে যত ট্র্যাজেডি বয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে ন্যায়-ইনসাফের এ সততার যখনই খুন হয়েছে, সবগুলো দেশের সর্ববৃহৎ ও সেক্যুলারিজমের সবচেয়ে বেশি বুলি আওড়ানেওয়ালা দল কংগ্রেসের শাসনামলেই হয়েছে। এ এক নির্মম ও আশ্চর্যজনক বাস্তবতা!

মুসলিমরা শুরু থেকেই এ কথা বলে আসছে যে, আমাদের আদালত ও আইনের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আর দেশের প্রত্যেক নাগরিকের আদালতের ওপর আস্থা থাকাই উচিত। কিন্তু শঙপরিভার সর্বদা এ কথাই বলে আসছিল যে এটি বিশ্বাস ও আস্থার বিষয়, আদালত এ ব্যাপারে রায় দেওয়ার অধিকার রাখে না। অতএব আদালত চাই যে রায়ই দিক, আমরা জন্মস্থান মন্দির যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই বানাব। কিন্তু স্বীয় পক্ষপাতমূলক আদালতের রায়ের পর তার এই সুরের আওয়াজ কমে যায়। বাকি রইল কংগ্রেসের ব্যাপার, তো 'দি সানডে গার্ডিয়ান'-এর এডিটর ও 'ইন্ডিয়া টুডে'র এডিটরিয়াল ডিরেক্টর এ জে আকবরের কথামতো "এই বিবাদের বিষয়ে কংগ্রেসের পলিসির একটিই টার্গেট ছিল, তা হচ্ছে মুসলিম ভোটগুলো খোয়ানো ব্যতীত কিভাবে মন্দিরটা নির্মাণ করা যায়।" (সাহারা-নয়াদিল্লি ৩/১০/২০১০ ইং)

কংগ্রেসের উক্ত পলিসিকে সামনে রেখে তারা একদিকে তো স্বস্তির শ্বাস নেয়, আর অন্যদিকে বিভিন্ন পন্থায় তারা এই প্রচেষ্টায় লেগে গেল যে, মুসলমানরা যেন এই রায় মেনে এই বিবাদকে নিষ্পত্তি করে দেয়। কিন্তু তারা নিজেদের এই প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল দেখে পরিশেষে তারা পরস্পরে আলোচনার ছিদ্র বের করে। সামনে দেখুন তাদের সাজানো নাটক কোন দিকে গড়ায়! রায়টি আসার পূর্বেই

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিডিয়ায় এক নির্দেশনা জারি করলেন যে, শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে রায়ের ওপর কোনো প্রকার আলোচনা-সমালোচনা যেন না করা হয়। আর মিডিয়াকেও এই নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় যে, রায়ের ব্যাপারে পারতপক্ষে খবর কম প্রচার করবে। যেহেতু কোনো রায় গ্রহণযোগ্য ও আস্থাশীল হওয়ার জন্য তা সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিতে হওয়া পূর্বশর্ত। এ জন্যই মতামত প্রকাশের অধিকার হরণের পূর্বোক্ত নির্দেশ সত্ত্বেও রায় প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ইন্ডিয়ার বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ ও ইতিহাসবিদদের যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, তারা এক বাক্যে বলে উঠেন যে দেশের আদালতের ওপর আস্থা রাখা সত্ত্বেও এই বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আইন-আদালতের বন্ধন ভেঙে তাকে বিশ্বাস ও ভক্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।

মোটকথা, হাইকোর্টের এই রায় দেশের জনগণকে এরূপ দুই রাস্তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যাতে একটি তো হক ও ন্যায় এবং আইন-শৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে। অপরটি অন্যায়-বিশৃঙ্খলার দিকে। আর কিছু হাতে গোনা লোক ব্যতীত দেশের অধিকাংশ নাগরিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের পথকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তাই অধিকাংশ নাগরিকের মতামত এটিই যে, এই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হোক। কেননা দেশ ভক্তি-বিশ্বাসের ওপর নয়, আইন-আদালত মতে চলবে।

**সুপ্রিম কোর্টে মামলা ও কাল্পনিক তথ্যে বায়বীয় রায় :**

৯ মে ২০১১ ইং সালে সুপ্রিম কোর্ট আবেদনের প্রেক্ষিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশ দেয়।

২ মার্চ ২০১৭ ইং সালে সুপ্রিম কোর্ট তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জে এস খেহার সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে কোর্টের বাইরে সমাধান খোঁজার কথা বলেন।

১ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ৩২ জন সিভিল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট মামলা করে।

৮ জানুয়ারি ২০১৯ ইং সালে সুপ্রিম কোর্ট উক্ত মামলার শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, শরদ অরবিন্দ বোরদে, এন ভি রমন, ইউ ইউ ললিত, ও ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়াকে নিয়ে ৫ সদস্যের বেঞ্চ গঠন করে।

২৫ জানুয়ারি ২০১৯ ইং সালে বিচারপতি ইউ ইউ ললিত এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালে সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, শরদ অরবিন্দ বোরদে, এস আব্দুন নাজির, অশোক ভষন ও ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়াকে নিয়ে ৫ সদস্যের বেঞ্চ পুনর্গঠন করে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইং সালে সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতার কথা জানায়। ৩ সদস্যের মধ্যস্থতাকারী কমিটি তৈরি করে দেয়।

৯ মে ২০১৯ ইং সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতাকারী কমিটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করে।

১ আগস্ট ২০১৯ ইং মধ্যস্থতাকারী কমিটি সুপ্রিম কোর্টে সিল করা খামে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

৬ আগস্ট ২০১৯ ইং সুপ্রিম কোর্ট উক্ত মামলার প্রতিদিন শুনানির ঘোষণা করে।

১৬ অক্টোবর ২০১৯ ইং শুনানির শেষে ঘোষণা করে আদালতে রায় সংরক্ষিত রাখে।

৯ নভেম্বর ২০১৯ ইং সালে সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। তাতে নির্দেশ হয়, "মুসলিম ঐতিহ্যের স্বাক্ষরবাহী অর্ধ সহস্রাধিক বছরের বেশি পুরনো মসজিদটির জায়গায় মন্দির তৈরি করবে। আর মসজিদ নির্মাণের জন্য অন্যত্র ৫ একর জমি দেওয়া হবে।"

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ন্যায় উগ্র হিন্দুদের আবেগ ও ভক্তির ভিত্তিতে হয়েছে। ইতিহাস, তথ্য-প্রমাণ ও আইনের কোনো তোয়াক্কাই তাতে করা হয়নি। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে এসে সম্পূর্ণভাবে আইনবহির্ভূত এ রায় এখন পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য বলে অনেকে অভিহিত করেন।

অযোধ্যা মামলা এর আগেও সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে। তখন সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিয়েছিল যে, এখানে সাড়ে পাঁচ শ বছরের পুরাতন মসজিদের জায়গায় কাল্পনিক কারণে মন্দিরের দাবি করা অযৌক্তিক। কিন্তু আজ কিসের তাড়নায় এ স্ববিরোধী রায় এল?

ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এ এস আই) জানিয়েছিল যে, বাবরী মসজিদের নিচে একটি প্রাচীনতর কাঠামো পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই কাঠামো যে মন্দির ছিল তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। সুপ্রিম কোর্ট নিজেও মেনে নিয়েছিল যে, পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্টে মন্দির থাকা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয়নি। তার পরও এই রায় প্রমাণ করে যে, এটি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হয়েছে। এখন আমি যদি বলি যে, আপনার বাড়ির নিচে আমার একটি বাড়ি রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে কি আপনার বাড়িটি ভেঙে আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে? ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ তো আদালতের কাজ নয়। বরং আদালত তো অকাট্য প্রমাণ ও প্রামাণ্য নথিপত্রের ভিত্তিতে রায় দেবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ইন্ডিয়ার বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ ও ইতিহাসবিদদের যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, তারা একবাক্যে বলে উঠেন যে দেশের আদালতের ওপর আস্থা রাখা সত্ত্বেও এই বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকার

করতে হবে যে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আইন-আদালতের বন্ধন ভেঙে তাকে বিশ্বাস ও ভক্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।

অথচ কিছু উগ্রবাদী এই রায়ের পক্ষে এই উক্তি পেশ করছে যে "এই রায় বিশ্বাসকে আইনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, বরং বিশ্বাসকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু আমরা বলব যে সপক্ষে রায় পেয়ে উগ্রবাদীরা অতিশয় আগ্রহভরে রায়ের পক্ষে দলিল খুঁজছে। কিন্তু তার ও তার সমমনা লোকদের এ কথা স্মরণ করা উচিত যে আইনের বন্ধন মুক্ত হয়ে কালকে যখন এই আস্থার ভূত বোতল থেকে বের হবে, তখন রবীন্দ্রনাথপুরী, বিন্ধাপুর, অমরাওতি, তীর, তারবুনী, জজুলা, ইহবল, ইলোরা ও শ্রীনগর ইত্যাদি স্থানের মন্দিরগুলোর কী অবস্থা হবে? যেগুলো ঐতিহাসিকদের মতে এবং বৌদ্ধ লামাদের মতে বৌদ্ধ বিহারগুলোকে অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক দখল করে মন্দির বানানো হয়েছে। (দেখুন : মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যমুনা দাসের বই "তরবীনি মন্দির বৌদ্ধদের উপাসনালয় ছিল।")

এছাড়া স্বয়ং অযোধ্যার অনেক মন্দিরও এই ভক্তি-শ্রদ্ধার ভূত থেকে কি নিজেকে বাঁচাতে পারবে? কেননা চীনের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পর্যটক হিয়ন শিয়াং রাজা হরষের (প্রকাশ রাজা সালাবত) যুগে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্তানের ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি প্রায় ১৫-১৬ বছর এখানে থেকে দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে রয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনি হিন্দুস্তানের প্রাচীন ইতিহাসের দস্তাবেজ হিসেবে মান রাখে। এই বইয়ের ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তিনি তাঁর এই ভ্রমণকাহিনিতে অযোধ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, "এখানে (অযোধ্যায়) এক শ উপাসনালয় (বিহার) এবং কয়েক হাজার উপাসক আছে। আমি অযোধ্যায় বৌদ্ধদের মৌলবাদী ও প্রগতিবাদী উভয় মতাবলম্বীদের বই পাঠ করেছি।"

চীনা পর্যটকের এই লেখা দাবি করছে যে, সপ্তম খ্রিস্ট শতাব্দীতে অযোধ্যায় এক শ বৌদ্ধবিহার ছিল। কিন্তু যখন বিহারের এক ব্রাহ্মণ নেতা কামারেল এবং তারপর তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য শংকর আচারিয়া (যাদের যুগ অষ্টম শতাব্দীর শেষ এবং নবম শতাব্দীর শুরুভাগে ধারণা করা হয়) বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে শিবভক্তির আন্দোলন করল, তখন বৌদ্ধ ধর্ম টিকে থাকতে পারেনি। ফলে হিন্দুস্তানে বিস্তৃত বড় বড় বৌদ্ধবিহার ও পুরনো উপাসনালয়সমূহ হয়তো ধ্বংস করে দেওয়া হয়, অথবা সেগুলোকে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়। এই যুগেই অযোধ্যার এক শ বিহারকে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

অতঃপর যখন প্রসিদ্ধ লিডার রামানন্দের (জন্ম : ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ) আন্দোলন ও প্রচেষ্টায় উত্তর হিন্দুস্তানে শিবভক্তির মোকাবেলায় বিষ্ণুভক্তির জয় হয়। আর বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামজির পূজা ব্যাপক হয়। তখন ওই

শিবমন্দিরগুলোকেই রামমন্দির নাম দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে কি এখন দেশের এই প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলোকে আস্থা ও ভক্তির চরণে বলি দেওয়া হবে?

আর এই কথা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি জানে না যে, সভ্য পৃথিবী আইন-আদালতের মুখাপেক্ষী এ জন্যও যে, একসঙ্গে বসবাসরতদের মাঝে যখন প্রবৃত্তি, আবেগ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মাঝে পরস্পর বিবাদ হয়ে, তখন নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে তার সমাধান করা যায়। কিন্তু যখন আইনের মোকাবেলায় ভক্তি-শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তখন এই বিবাদ না মিটে বরং আরো বাড়তে বাড়তে বিরাট আকারে ধারণ করে দেশের আইন বিনাশ করবে, যা বাবরী মসজিদের রায়েও প্রত্যক্ষ করা হলো। আর হিন্দুস্তান বিভিন্ন ধর্ম ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতার লালনভূমি। আর প্রত্যেক ধর্ম ও সভ্যতার অনুসারীদের ভক্তি ও বিশ্বাসে ভিন্নতা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হবে যে, কার বিশ্বাসকে আদালত মানদণ্ড বানাবে? যদি এর জবাবে বলা হয় যে, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা ও বিশ্বাসকে রায়ের মানদণ্ড বানানো হবে। তাহলে তো ওই সময় দাবীকৃত গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের থেকে বের হওয়া আবশ্যক। তাহলে দেশের গণতন্ত্রপন্থী ও সেক্যুলার মতাবলম্বী জনগণ গণতন্ত্রের ওপর এরূপ নগ্ন হামলার ওপর নীরব থাকবে?

**মুসলিম সংস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত**

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দসহ অন্য ইসলামিক সংস্থাগুলো এই রায়ে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই তারা সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় রিভিউ আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি আল্লামা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী সাহেব বলেন যে, "আমরা এ বিষয়ে আইনবিদদের সাথে পরামর্শ করেই রিভিউ আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

আর মুসলিমগণ নিজ শরীয়ত মতেও এ বিষয়ে দায়বদ্ধ যে, তারা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে দ্বীনি নিদর্শনাবলির সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে। বাকি রইল রিভিউর চূড়ান্ত রায়ের কথা, তা তো আমাদের হাতে নেই। আমাদের চেষ্টা তো আমাদের সাধ্যমতো করে যেতে হবে। কিন্তু তার পরও যদি আমরা ন্যায়বিচার না পাই, তাতে তো আমাদের হাতে কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা বান্দার চেষ্টা দেখেন, পরিণাম তো তাঁর কুদরতি হাতে।

# পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে
# ‘খতমে নবুওয়াত’ আকীদা-১০

শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক আহমদ

**মসীহে মওউদ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তির জবাব :**

হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ حذيفةَ بن أسيد الْغفارىّ قَالَ : اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ .فَقَالَ :مَا تَذْكُرُونَ؟ . قَالُوا :نَذْكُرُ السَّاعَةَ .قَالَ " :إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ :خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلٰى مَحْشَرِهِمْ ."وَفِى رِوَايَةٍ :نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلٰى الْمَحْشَرِ .وَفِى رِوَايَةٍ فِى الْعَاشِرَةِ وَرِيحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ .رَوَاهُ مُسلم

হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, একদা আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় নবী করীম (সা.) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ? তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামতসংক্রান্ত আলোচনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। সে আলামতগুলো হলো : ১. ধূম্র (যা একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পূর্ব দিক হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখবে।) ২. দাজ্জাল, ৩. চতুষ্পদ জন্তু, ৪. পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর আসমান হতে দুনিয়ায় অবতরণ, ৬. ইয়াজুজ ও মাজুজের আত্মপ্রকাশ, (৭, ৮, ৯) তিন স্থানে তিনটি ভূমিধস। পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরব উপদ্বীপে। ১০. সবশেষে ইয়েমেন হতে এমন এক অগ্নিশিখার আগমন, যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আদন এর অভ্যন্তর ভাগ হতে আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর অন্য এক বর্ণনায় দশম আলামত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এমন এক বায়ু প্রবাহিত হবে, যা মানুষদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)

**সর্বশেষ দাজ্জাল ও হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন :**

وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

دجال শব্দের বিশ্লেষণ :

دجال শব্দটি دجل থেকে উৎকলিত। এর অর্থ প্রতারণা, মিথ্যা, ধোঁকা, গুলিয়ে ফেলা ইত্যাদি। যেহেতু দাজ্জালের মধ্যে এরূপ সকল মন্দগুণই বিদ্যমান থাকবে, সে কারণে তাকে দাজ্জাল বলা হয়ে থাকে।

**দাজ্জাল সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা :**

তাদের আকীদা হলো দাজ্জাল একজন অন্ধ, কুশ্রী, বীভৎস ইহুদি বংশোদ্ভূত লোক। ইহুদিরা তার অনুকরণ করবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সে ভয়াবহ ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। প্রথমে সে নবী হওয়ার এবং পরে স্বয়ং প্রভু হওয়ার দাবি করবে। হযরত ঈসা (আ.)

আসমান থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ দুটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.)-এর বদ দু'আর কারণে একসাথে ধ্বংস হবে।

**মির্জা কাদিয়ানীর আকীদা :**

মির্জা গোলাম কাদিয়ানীর ভাষ্য হলো, দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদের একটি অংশ (এযালাতুল আওহাম ২০৬, ফতহুল ইসলাম ৯) ইয়াজুজ মাজুজ হলো ব্রিটিশ এবং রাশিয়া। আর মসীহ হলাম আমি নিজেই। (এযালাতুল আওহাম ২০৭, হাশিয়ায়ে হামামাতুল বুশরা ৭৫ ইত্যাদি, তাকাবুলী মুতালা'আর সূত্রে)

**পর্যালোচনা :**

খাতেমুন্নবিয়্যীন (সা.) ইরশাদ করেন, দুনিয়ার প্রারম্ভ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের এত বৃহৎ ফেতনার মতো আর কোনো ফেতনা হবে না। খ্রিস্টান পাদ্রি যারা মির্জা কাদিয়ানীর কথানুযায়ী শত শত বছর ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করে আসছে, স্পেন, গ্রানাডা ও সিরিয়ায় তাদের কারণে লাখো মুসলমানের গর্দান কর্তিত হয়েছে, মির্জা কাদিয়ানীর ইয়াজুজ মাজুজ রাশিয়া ও ইংরেজদের আধিপত্য ও রাষ্ট্রক্ষমতা শত শত বছর থেকে বিদ্যমান কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দীর্ঘ সময়ে হযরত মসীহ (আ.)-এর আগমন হলো না কেন?

**মির্জা কাদিয়ানীর মসীহ হওয়ার দাবি :**

এসব লম্বা বক্তৃতার পর মির্জা কাদিয়ানীর দাবি হলো “মসীহ আমি নিজেই”। এটি

এমন এক অদ্ভুত মিথ্যাচার, যার নজির দুনিয়ায় আর পাওয়া যায় না। কারণ শেষ যুগে হযরত মসীহ (আ.)-এর আগমনের যতগুলো আলামত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার কোনো একটির ন্যূনতম আলামতও মির্জা কাদিয়ানীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। বরং আলামতের আলামতও পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা মির্জা কাদিয়ানীর মধ্যে নেই। স্বয়ং পবিত্র কুরআনে মসীহ (আ.)-এর নাম, উপনাম, উপাধি, বংশ, জন্মস্থান এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অন্য কোনো নবী-রাসূলের ব্যাপারে এত সবিস্তার আলোচনা করা হয়নি।

মুফতী শফী (রহ.) কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ (আ.)-এর পরিচয়ে ১৭৭টি নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। তাতে লেখেন যে, গোলাম কাদিয়ানীর নাম কি ঈসা? তার মাতার নাম কি চেরাগ বিবি নয়? নাকি মারইয়াম? তার পিতার নাম গোলাম মোর্তাজা নয়? নাকি সে পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে। তার জন্মস্থান কি কাদিয়ান নামের পল্লীতে নয়? নাকি দামেস্ক? নাকি কাদিয়ান পল্লীটি দামেস্কের কোনো জেলা বা থানার নাম? তার সমাধিস্থান কি কাদিয়ান নয়? নাকি মদীনায়ে তাইয়িবায়? তার নাম কি এমরান? মামার নাম কি হারুন? নানির নাম কি হেনা? ইত্যাদি। তিনি আরো লেখেন, দুনিয়ায় কোনো লোকের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা লিখে দিলেই পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জাতীয় পরিচয় পত্রে প্রাগুক্ত তিন বস্তু থাকলেই হয়। সারা পৃথিবীর যেকোনো স্থানেই থাকুক তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। উক্ত তিনটি বিষয় লেখা থাকলে দুনিয়ার যেকোনো প্রান্ত থেকে পত্রাদি সঠিক স্থানে পৌঁছে যায়। শুধু ওই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে যেকোনো লোকের স্বত্বাধিকারভুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে অধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ রাসূল (সা.) হযরত মসীহ (আ.) সম্পর্কে শুধু ওই তিনটি বিষয় বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং দুনিয়াতে হযরত মসীহ (আ.)-এর নামে যে পত্র পাঠানো হয়েছে তার এক পিঠে তাঁর নাম, পূর্ণ ঠিকানা, পুরো জীবনালেখ্য, চরিত্র মাধুর্য, কীর্তি, অবতরণের স্থান, মৃত্যুর স্থান, কবরের স্থানসহ ভৌগোলিক যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করেছেন। এমনকি তাঁর লেবাস-পোশাকের বর্ণনাও দিয়েছেন। তাতেও শেষ নয় বরং তাঁর বংশপরম্পরা, তাঁর সহযোগী এবং অনুসারীদের পরিচয়ও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কতিপয় লুটেরা নবী (সা.)-এর এহেন যাবতীয় চেষ্টা-মেহনতকে সমাধিস্থ করে সে পত্র করায়ত্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে–নিজেকেই মসীহ বলে দাবি করে বসেছে। (মসীহে মাউদ কি পহচান দ্রষ্টব্য)

**উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় দাজ্জাল আগমনের কিছু হিকমত :**

**প্রশ্ন :** উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় দাজ্জাল আগমনের হিকমত কী?

**উত্তর :** বিশ্ব প্রকৃতির ওপর নজর ফেরালে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের একটা মূল ভিত্তি আছে। যেমন সূর্য। যা দুনিয়ায় আলোর কেন্দ্রবিন্দু। আগুন। যা যাবতীয় উষ্ণতা ও গরমের মূল। তেমনি সকল মুমিনের ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মহানবী (সা.) আর যাবতীয় কুফর, অসৎকাজ ও গোনাহের কেন্দ্রবিন্দু হলো দাজ্জাল। যেমন মুমিনের রূহের জন্য আধ্যাত্মিক পিতা হলেন নবী করীম (সা.), তেমনি পুরো কুফরী জগতের আধ্যাত্মিক পিতা হলো দাজ্জাল। নবী (সা.) যেমন খাতেমুন নাবিয়্যীন, তেমনি দাজ্জালে আকবর হলো খাতেমুদ দাজ্জালীন। যেমন খাতেমুন্নবিয়ীনের একটা মোহরে নবুওয়াত আছে। খাতেমুদ্দাজ্জালীনেরও একটা মোহরে কুফর আছে। কিয়ামতের পূর্বে যেমন দাব্বাতুল আরদের মাধ্যমে মুমিনদের ঈমানের প্রকাশ্য রূপ দেখানো হবে, তেমনি কাফিরদের কুফর কপালে প্রকাশ করা হবে। যেমন মোহরে নবুওয়াত ঈমানের প্রকাশ্য বাস্তব দলিল। তেমনি দাজ্জালের কপালে কুফরের মোহর হবে কুফরীর প্রকাশ্য ও বাস্তব দলিল। হাদীস শরীফে আছে, مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ তার দুই চোখের মাঝখানে كافر লেখা থাকবে। (বুখারী শরীফ, হা. ১৫৫৫)

যেমন পূববর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূল নবী করীম (সা.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তেমনি তারা দাজ্জালের ভীতি সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। সুতরাং খাতেমুন নাবিয়্যীন (সা.) যেমন সর্বশেষ উম্মতে আগমন করেছেন, তেমনি খাতামুদ দাজ্জালীনও সর্বশেষ জামানায় আসা যুক্তিসঙ্গত।

**মসীহে দালালাত মসীহে হেদায়াত (আ.)-এর হাতে ধ্বংস হওয়ার হিকমত :**

যুক্তিসঙ্গত কথা হলো খাতেমুদ দাজ্জালীনের মোকাবেলা খাতেমুন নাবিয়্যীনই করবেন। কিন্তু হযরত মসীহ ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর এমন কী বৈশিষ্ট্য তিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে দাজ্জালকে খতম করবেন? এর হিকমত কী?

**উত্তর :** নবী করীম (সা.) এলম ও আমলের সর্বশেষ কেন্দ্রবিন্দু। কেউ তাঁর সাদৃশ্যও হতে পারে না, বিকল্পও হতে পারে না। না কেউ তাঁর সমপ্রতিপক্ষ হতে পারে। সূর্যের সামনে যেমন কোনো প্রকার অন্ধকার অসম্ভব, তেমনি রিসালাতের সামনেও সর্বপ্রকার দাজ্জালিয়্যাতের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। সে কারণে দাজ্জাল নবী করীম (সা.)-এর

যামানায় প্রকাশ হতে পারেনি। তবে এর প্রতিরোধে পূর্ববর্তী কোনো নবী মুহাম্মদী শরীয়তের অনুসারী হয়ে আগমন করতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, لتومنن به ولتنصرنه এই আয়াতে নবী করীম (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনা এবং সাহায্যের ওয়াদা সকল নবী-রাসূল থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর সাহায্যের জন্য পূর্ববর্তী নবীদের কারো আগমন আবশ্যক। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় হযরত মসীহ ইবনে মারইয়াম (আ.) নবী করীম (সা.)-এর বিশেষ নায়েব। সুতরাং তাঁরই আগমন হওয়া উচিত।

২। সে কারণে আল্লাহ তা'আলা সূরা জিনে রাসূল (সা.)-কে আব্দুল্লাহ উপাধি দিয়েছেন لما قام عبد الله يدعوه আবার হযরত মসীহ (আ.)ও নিজের জন্য সে উপাধি গ্রহণ করেছেন। قال انى عبد الله এখানে পার্থক্য শুধু হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়ার খবর নিজে দিয়েছেন আর রাসূল (সা.) আল্লাহর বান্দা হওয়ার খবর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

৩। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামের খুব নিকটবর্তী, ঈসা (আ.)-কে নবী করীম (সা.)-এর ন্যায় দৈহিক মে'রাজে শরীক করা এই নৈকট্যের কারণেও হতে পারে।

৪। আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি কোনো বস্তু সৃষ্টি করলে তার বিপরীত বস্তুও সৃষ্টি করে থাকেন। প্রবাদ আছে, وبضد هاتتبين الاشياء যেমন অন্ধকারের বিপরীত আলো, শয়তানের বিপরীত ফেরেশতা সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানকে যেমন দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছে সে হিসেবে ফেরেশতাদেরকেও দান করা হয়েছে। শয়তানকে বিভিন্ন রূপ ধারণ, আকৃতি গ্রহণ, উপরে ওঠা, নিচে অবতরণ করা, ক্ষণিকের মধ্যে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদির শক্তি দেওয়া হয়েছে। যে শক্তি পরিপূর্ণভাবে ফেরেশতাদেরও দান করা হয়েছে। যাতে বৈপরিত্বের মধ্যে সমতা থাকে। ফেরেশতা এবং শয়তানের পরস্পর এই বৈপরিত্ব দীর্ঘকাল যাবৎ গোপনে ও নীরবে চলতেছিল। একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় তা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে।

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মসীহে দাজ্জালকে সৃষ্টি করেছেন। যা মানুষের আকৃতিতে শয়তানিই বটে। যাকে হযরত সুলাইমান (আ.) একটি দ্বীপে বন্দি করে রেখেছেন। (ফতহুল বারী)

এরপর একজন এমন নবী সৃষ্টি করলেন, যার মূল উপকরণ মালাকী ও জিবরাইলী তথা ফেরেশতাসুলভ। কিন্তু আকৃতি মানুষের। অর্থাৎ মসীহ ইবনে মারইয়াম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, كلمته القاها الى مريم وروح منه অর্থাৎ ঈসা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি শব্দ রূহ। যা মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৫। দাজ্জাল যেমন ইহুদি তথা বনি ইসরাইলের বংশোদ্ভূত, তেমনি হযরত ঈসা (আ.)ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত।

৬। দাজ্জালকে যেমন একটি দ্বীপে বন্দি করে রেখে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছে, তেমনি হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দীর্ঘ হায়াত দান করা হয়েছে।

৭। দাজ্জালকে যেমন কয়েক দিনের জন্য মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দেওয়া হবে, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) কে মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করা হয়েছে।

৮। হযরত ঈসা (আ.) কে যেমন পবিত্র কুরআনে ولنجعله آية للناس তথা নিদর্শন বলা হয়েছে, তেমনি দাজ্জালের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আয়াত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। يوم ياتى بعض آيات ربك হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে 'আয়াত' শব্দ থেকে দাজ্জাল ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের নিদর্শন আর দাজ্জাল হলো ফেতনার নিদর্শন।

৯। দাজ্জাল নিজেকে মসীহ দাবি করে খাতেমুল আম্বিয়ার পরে নবুওয়াতের দাবি করবে। মানুষ তার প্রতারণার শিকার হয়ে মসীহে দালালাতকে মসীহে হেদায়াত মনে করে তার ওপর ঈমান আনবে এবং ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। সে কারণে মসীহে হেদায়াত তথা হযরত ঈসা (আ.)-কে পাঠানো জরুরি। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করার হুকুমপ্রাপ্ত হয়েছেন যাতে লোকেরা এহেন অসাধারণ ভুল থেকে মুক্তি পায় এবং কে মসীহে দালালাত আর মসীহে হেদায়াত তা পার্থক্য করতে পারে।

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون

এই মারইয়ামের পুত্রই ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (সূরা মারইয়াম ৩৪)

১০। হযরত ঈসা (আ.) মানুষ। মানুষের মৃত্যু জমিনেই হয়। সে কারণে ঈসা (আ.)-এর হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তাঁকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। যাতে তিনি দুনিয়াতেই ইন্তেকাল করেন। আসমানে তাঁর ইন্তেকাল হবে না। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى

এই মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। (সূরা ত্বাহা ৫৫) (জুহুরে মাহদী হযরতুল আল্লাম ইদ্রিস কান্দালভী রহ.)

১১। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ইন্তেকালের পর যখন বনী ইসরাইল

অধঃপতনের দিকে যেতে লাগল এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন বাবেল এবং আসিরিয়ার ক্ষমতাসীনগণ তাদের দাসে পরিণত করে দুনিয়ায় তাদের পদদলিত করল তখন বনি ইসরাইলের নবীগণ সুসংবাদ দিলেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম মসীহ হিসেবে এসে তাদেরকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করবেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর ইহুদিরা তাঁকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত রূপে না পাওয়ায় মসীহ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেনি। বরং হযরত ঈসা (আ.)-কে ধ্বংস করার পাঁয়তারা আরম্ভ করল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা দাবি করে বসল ঈসা (আ.)-কে তারা হত্যা করেছে। তাঁকে অপমানিত ও হেয়প্রতিপন্ন করল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে এমনভাবে প্রেরণ করবেন, যাতে মানুষ দেখবে ইহুদিরা 'তাকে হত্যা করেছে' মর্মে স্পষ্ট মিথ্যা কথাই বলত। অথচ তিনি জীবিত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে ইহুদিদের সম্মানিত ব্যক্তি, যার আগমন প্রতীক্ষায় তারা প্রহর গুনত সে মসীহে দাজ্জালকে তিনি বাবে লুদে হত্যা করবেন।

১২। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم

আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈসা (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর মতোই। হযরত আদম (আ.)-কে খমীর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে মাটিও ছিল। তাই তাঁকে আসমান থেকে জমিনে পাঠানো হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) জিবরাইল (আ.)-এর ফুৎকারে সৃষ্টি হয়েছেন। তাই তাঁকে জমি থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নবীগণের প্রারম্ভ তথাপি নবী-রাসূলদের ধারাপরম্পরা হযরত আদম (আ.) দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সে রকম যদিও হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতেমুন নাবিয়্যীন তথাপি হযরত ঈসা (আ.)-কে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ করবেন এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

বৈপরিত্বের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে। কারণ প্রথমে শুধু পুরুষ থেকে নারী সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার শেষের দিকে আসমান থেকে এমন নবীকে পাঠাবেন, যিনি শুধু নারী থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.), যিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন।

**হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতে মুহাম্মদীর একজন সদস্য হিসেবে আগমন করা :**

**প্রশ্ন :** কাদিয়ানীরা বলে, উম্মতে মুহাম্মদী যাকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে, যে উম্মতের শানে বলা হয়েছে–

كانبياء بنى اسرائيل

তাদের সংশোধনের জন্য কোনো নবীকে আসমানে রেখে দেওয়া যার কারণে মনে হয় এই উম্মতে কোনো যোগ্য ব্যক্তি নেই, যারা এ উম্মতকে ইসলাহ করবে। তা কি এই উম্মতের জন্য অপমান নয়? এই উম্মতে কি কোনো মুজাদ্দিদ নেই?

**উত্তর :**

যেহেতু পূর্বের নবী এই উম্মতের সদস্য হিসেবে আগমন করবেন, সেহেতু তা এ উম্মতের অপমান নয় বরং সম্মান। হাদীস শরীফে এসেছে এটি উম্মতে মুহাম্মদীর গৌরব ও সম্মান যে, একজন বড় পয়গাম্বর এই উম্মতের সদস্য হিসেবে আগমন করবেন। হযরত ঈসা (আ.) নিজেই দু'আ করেছেন, আপনি আপনার খাদেম (ঈসা)-কে কিয়ামতের দিন আপনার রাসূলের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। (ইঞ্জিল বরালবনাস ফসল ২১২, ১৯৪ তাকাবুলী মুতালা'আর সূত্রে)

এখন বলুন, এটি কি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অপমান নাকি সর্বোচ্চ সম্মানের দলিল? ঈসায়ীরা যাকে খোদা মানে তিনি এই উম্মতের একজন সদস্য হয়ে আগমন করবেন। এই উম্মতের জন্য এর চেয়ে সম্মানের বিষয় আর কী হতে পারে?

জ্ঞান-বুদ্ধির কতবড় দুশমন এই কাদিয়ানীরা! তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনকে এই উম্মতের জন্য অপমানজনক বলে প্রচার করে কিন্তু খাতামুন নাবিয়্যীনের (সা.) পর মির্জা কাদিয়ানীর মতো নাপাক লোককে নবী হিসেবে গ্রহণে অপমান মনে করে না। (নাউজুবিল্লাহ)

হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য দ্বীনের বিধানাবলি ও শরীয়তে মুহাম্মদীতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা এর অপূর্ণতাকে পূরণ করার জন্য নয়। বরং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হলো ইহুদি-নাসারার সংশোধন, দাজ্জালকে হত্যা করা, ক্রুশ ধ্বংস করা ইত্যাদি। উম্মতে মুহাম্মদীকে সংশোধন করার কথা এই অভিশপ্ত কাদিয়ানীরা কোথায় পেল?

علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل

বনী ইসরাইলের নবীগণ যেভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন এই উম্মতের আলেমগণ সে কাজ করবেন। কারণ আমার পর আর কোনো নবীর আগমন হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের সমান মর্যাদাবান হবে। বা কোনো প্রকার নবী হওয়ার দাবি করবে। (নাউজুবিল্লাহ)

**উপসংহার :**

কাদিয়ানীদের বিভিন্ন কিতাব ও লিটারেচারে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত হেনে অসংখ্য অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা দাবি পাওয়া যায়। যা একত্রে ছোট পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বরং এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিশাল খিদমাত রয়েছে। কেউ কেউ ২০-৩০ খণ্ডেরও কিতাব লেখেছেন এসব বিষয়ে। বিশ্বের সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মত হলো,

কাদিয়ানীরা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার কারণে স্পষ্ট কাফির। তারা কোনো মুসলিম দেশে থাকতে হলে ভিন্ন ধর্মীয় হিসেবেই থাকবে। এটি বিশ্ব মুসলিমের দাবি।

**বিভিন্ন দাবির আড়ালে প্রতারণা :**

কাদিয়ানীরা বলে থাকে, আমরা খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাসী, কাদিয়ানীকে আমরা নবী মানি না বরং ইমাম মাহদী বা মসীহে মওউদ মানি। এই বলে অনেকে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে থাকে।

মূলত গোলাম কাদিয়ানী নিজেকে দাবি করেনি এমন কিছুই বাকি নেই। ওলী, মুজাদ্দিদ, মুহদাস, নবী, রাসূল, ইমাম মাহদী, মসীহে মওউদ ইত্যাদি সব কিছুই। আবার তার দাবিগুলোও এমন নয় যে, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা দাবি করেছে। তার সব কিছু দাবিই বলবৎ এবং বিদ্যমান। তার এমন কোনো কথা নেই যে, আমি এই দাবি থেকে তাওবা করে এই দাবি করছি। তা থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন দাবিচ্ছলে সে ইসলাম নিয়ে উপহাস এবং মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে। সুতরাং এমন কথা বলার কোনোই সুযোগ নেই যে, আমরা তাকে ইমাম মাহদী মানি বা মসীহে মওউদ মানি। নবী-রাসূল মানি না। সে কারণে তারা মুসলমান হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। তাদের এই মিথ্যাটা তখনও প্রমাণিত হয় যখন তাদের পুরো সিস্টেমের দিকে নজর ফেরানো হয়। তারা গোলম কাদিয়ানীকে নবী মেনে পরের নেতাদেরকে তারা ওই নবীর খলিফা বলে আখ্যায়িত করে। প্রথম খলিফা, দ্বিতীয় খলিফা, তৃতীয় খলিফা সেই হিসেবেই তাদের ধারাবাহিকতা রয়েছে। তাদের বেলায় কাদিয়ানীরা নবীদের মতো আলাইহিস সালাম ইত্যাদিও বলে থাকে। আমরা উপরে প্রথমে আলোচনা করেছি, সে কোনোভাবে নবী হতে পারে না। পরে আলোচনা করেছি কোনোভাবে সে ইমাম মাহদী হতে পারে না। এর পরে আলোচনা করেছি কোনোভাবে সে মসীহে মওউদও হতে পারে না। দলিলভিত্তিক এই আলোচনার পর কারও এই প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ারও কোনো পথ বাকি থাকে না যে, আমরা তাকে ইমাম মাহদী মানি, নবী মানি না ইত্যাদি।

মূলত কাদিয়ানীদের লিটারেচারগুলো পাঠ করলে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে, এদের যাবতীয় অপচেষ্টা ও অপপ্রয়াস হলো ইসলামের আকীদা ও অনুশাসনগত বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে সব সময়ের জন্য ফিতনা ও ফ্যাসাদ জিইয়ে রাখা। তাই ইসলামের বিভিন্ন স্পষ্ট বিষয়গুলোকে এমন অপব্যাখ্যা-অপবিশ্লেষণের মাধ্যমে আঘাতে জর্জরিত করেছে, যা পাঠ করলেই মুসলমান মাত্রই আহত না হয়ে পারে না। যার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরেই মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং মুসলিম দেশে দেশে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

এই কারণেই উলামায়ে কেরামের দীর্ঘদিনের দাবি হলো যেহেতু শরীয়তের নীতি অনুযায়ী কাদিয়ানীরা কোনোভাবেই মুসলমান থাকতে পারে না, সে কারণে মুসলিম সরকারগুলো যেন তাদের অমুসলিম ঘোষণা করে তাদেরকে অমুসলিম হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে মুসলিম দেশসমূহে অবস্থানের সুযোগ দিক। তাতে মুসলমানগণ অন্তত প্রতারণার শিকার হয়ে আকীদা-বিশ্বাস হারাবে না এবং মুসলিম দেশগুলো ইসলামের নামে তাদের পরিচালিত ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকবে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রায় দেশে যদিও ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা হয় না তথাপি প্রায় দেশেই শরীয়াহ বিভাগ কিংবা সংস্থা রয়েছে। যেগুলো রাষ্ট্রের অধীনেই পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ গবেষণার দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়ে থাকে। বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি সদিচ্ছা রাখেন তবে এসব সরকারি শরীয়াহ বিভাগ বা সংস্থার মাধ্যমে কাদিয়ানী সম্পর্কে গবেষণা করতে পারে। তাদের সমস্ত বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে একটি সুষ্ঠু সমাধান মুসলিম উম্মাহকে তারা উপহার দিতে পারেন।

বিশেষ করে, এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের দীর্ঘদিন থেকে তৈরি করা দস্তাবেজ ভাণ্ডারকে কাজে লাগালে সরকারকে এই ব্যাপারে অধিক কালক্ষেপণও করতে হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইসলাম, মুসলমান, রাষ্ট্র ও জাতির কথা বিবেচনা করে আমাদের সরকারগুলোর এরূপ অর্থবহ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর অটুট রাখুন এবং বাতিল আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখুন।

*(সমাপ্ত)*

গ্রন্থনা ও বিন্যাস
**মাওলানা মুহাম্মদ সুহাইল**
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া।

# ইমাম বোখারী রহ. ও ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর তাকলীদ

**মূল : মাওলানা আবু বকর গাজীপুরী (রহ.)**

**ভাষান্তর : মুফতী নূর মুহাম্মদ**

**মোহতারাম হযরত মাও. আবু বকর সাহেব গাজীপুরী**

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ

আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক প্রশ্নটির উত্তর অবশ্যই দেবেন। এ ক্ষেত্রে আমাকে আহলে হাদীস বা "সালাফী" মতাদর্শী মনে করে প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

ইমাম বোখারী (রহ.)-এর জন্ম সন ১৯৪ হি. এবং তাঁর মৃত্যু সন ২৫৬ হি.। ইমাম বোখারী (রহ.)-এর জীবদ্দশায় ইমাম চতুষ্ঠয় (রহ.)-এর মাযহাব বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি কোনো এক ইমামের 'তাকলীদ' কেন করলেন না? অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি একটু স্পষ্ট করবেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ইমাম বোখারী (রহ.) মুকাল্লিদ ছিলেন? নাকি গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন? আশা করি, প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

এম নেছার আহমাদ

গুজরাত।

**উত্তর :**

আমি আপনার মতো এমন একজন সত্যানুসন্ধানীর প্রশ্নের জবাব দিতে পেরে অনেক খুশি অনুভব করি। আসলে 'সালাফী' হওয়া আহলে হাদীস হওয়া দোষণীয় কিছু না। দোষ তো হলো তখন, যখন কেউ 'আহলে হাদীস' বা 'সালাফী' নাম ধারণ করে আইম্মায়ে দ্বীন আকাবীর আসলাফদের শানে অনুচিত মন্তব্য ও বেয়াদবিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মা-শাআল্লাহ আপনি অনেক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং আপনার লেখাই প্রমাণ বহন করছে যে, নিশ্চয়ই আপনার সম্পর্ক কোনো অভিজাত, ভদ্র-খান্দানের সঙ্গে রয়েছে। যদি সকল আহলে হাদীস মতাদর্শী আপনার আদর্শে আদর্শিক হতো, তাহলে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সাদরে গ্রহণ করতাম।

তবে আমি কখনো মেনে নিতে পারি না যে 'আহলে হাদীস' 'সালাফী' নাম ধারণ করে সবাই অভদ্রের চরম শিখরে পৌঁছে যাবে এবং আইম্মায়ে দ্বীন, ফুকাহায়ে উম্মত, আউলিয়ায়ে কেরাম ও আকাবীর আসলাফদেরকে ভর্ৎসনা ও ধিক্কারের নিশানা বানাবে। তাদের সম্পর্কে অনর্থক বকবক করতে থাকে। আমাদের মিশন তো কেবল এমন নামধারী আহলে হাদীস মতাদর্শীর বিরুদ্ধে যারা আকাবীর ও আসলাফের ছিদ্রান্বেষীতে চির বদ্ধপরিকর।

আপনার বক্তব্য ছিল যে ইমাম বোখারী (রহ.) ইমাম চতুষ্ঠয় থেকে কোনো এক ইমামের তাকলীদ কেন করেননি? তথাপি তিনি 'মুকাল্লিদ' না হয়ে গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন। আমি বলব, ইমাম বোখারী (রহ.)-এর সম্পর্কে আপনার এমন ধারণা কেবল অজ্ঞতা ও এ ব্যাপারে অধ্যয়নহীনতার বহিঃপ্রকাশ।

আপনাদেরই মান্য পুরোধাগণ তাঁকে 'মুকাল্লিদ' বলেছেন। নবাব ছিদ্দীক হাসান খান তাঁকে 'শাফেঈ' বলেছেন।

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)ও তাঁকে "শাফেঈ" বলেছেন।

(কাশ্‌শাফ তরজমা ইনসাফ-৬৭)

'তুবকাতুশ শাফেঈয়া' গ্রন্থেও ইমাম সুবকী (রাহ.) তাঁকে শাফেঈ বলেছেন। অনেকেই তাঁকে হাম্বলী বলেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

وائمة الحديث كالبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم ايضا من اتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما (فتاوى ابن تيميه ٢٣٢/٢٥)

অর্থাৎ আইম্মায়ে হাদীস, যেমন ইমাম বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ এবং তাঁরা ছাড়াও অন্য কতিপয় মুহাদ্দীসগণও ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার অনুসারীদের মধ্য হতে। তাছাড়া তাঁরা (উল্লিখিত মুহাদ্দীসগণ) তাঁদের দুজনের থেকে ফিকাহ ও হাদীসের ইল্‌মও অর্জন করেছেন।

ইমাম ইবনে কাইয়ুম (রহ.)ও ইমাম বোখারী (রহ.)-কে 'হাম্বলী' বলেছেন।

(ইলামুল মু'আক্বক্বীইন-১/২২৬)

সর্বোপরি তিনি চাই শাফেঈ হোক বা হাম্বলী হোক, তবে তিনি একজন 'মুকাল্লিদ' (কোনো ইমামের অনুসারী) কেউ তাঁকে গাইরে মুকাল্লিদ বলেননি। অতএব এতদসত্ত্বেও তাঁকে গাইরে মুকাল্লিদ বলা তাহক্বীকহীন কথার সম্প্রচার বৈ আর কী? আর যদি জোরপূর্বক তাঁকে 'মুজতাহীদ' বলা হয়, (যাতে করে তিনি মুকাল্লিদ প্রমাণিত না হন) তবে বলা হবে তিনি এমন মুজতাহীদ ছিলেন উম্মত যাঁর ফিকহী

মাসলাক গ্রহণ করেনি। তাছাড়া ইতিহাসে তাঁর অনুসারী হিসেবে একজন মুকাল্লিদও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম বোখারীর বিশেষ ছাত্রদের অন্যতম একজন। তিনি হাদীসের সিলসিলায় তাঁর মতামত, উক্তি নকল করেন ঠিকই, কিন্তু ফিকহী মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে কোথাও তাঁর মতামত উল্লেখ করেননি। অতএব বোঝা যাচ্ছে, স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর দৃষ্টিতেই তিনি শুধুমাত্র একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। ফিকাহের ক্ষেত্রে তাঁর স্বতন্ত্র কোনো মাযহাব ছিল না। বরং তিনি হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতামত গ্রহণ করতেন বা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উক্তি গ্রহণ করতেন। তবে হ্যাঁ, হাদীস জগতে তিনি মুজতাহীদ ছিলেন এবং আইম্মায়ে হাদীসের মাঝে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত।

সর্বশেষ একটা সূক্ষ্ম কথা জেনে নেন, যদি তাঁকে গাইরে মুকাল্লিদও সাব্যস্ত করা হয় তার পরও তিনি এ যুগের গাইরে মুকাল্লিদের মতো ছিলেন না। কেননা এ যুগের গাইরে মুকাল্লিদের মাযহাব হলো, একই মজলিসের তিন তালাক এক তালাকই হবে। আর ইমাম বোখারীর মতো গাইরে মুকাল্লিদের মাযহাব হলো, একই মজলিসের তিন তালাক তিন তালাকই হবে। আজকালের গাইরে মুকাল্লিদদের মাযহাব হলো, হায়েজ (ধাতু) চলা অবস্থায় যে তালাক দেওয়া হবে, তা পতিত হবে না। অথচ সে যুগের 'গাইরে মুকাল্লিদ' ইমাম বোখারীর মতামত হলো, সে অবস্থাতেও তালাক পতিত হবে।

আজকালের গাইরে মুকাল্লিদরা এক হাত দিয়ে মুসাফাহা করে। অথচ সে যুগের গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম বোখারী (রহ.) দুই হাত দিয়ে মুসাফাহার প্রবক্তা। আজকালের গাইরে মুকাল্লিদরা তাহাজ্জুদ ও তারাবীকে এক বলে। অথচ সে যুগের গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম বোখারী তাহাজ্জুদ ও তারাবীহকে ভিন্ন ভিন্ন নামায বলেছেন।

আজকালের গাইরে মুকাল্লিদরা (যিয়ারতের মাধ্যমে) কবর থেকে বরকত অর্জন হারাম বলে। অথচ ইমাম বোখারী কবর থেকে বরকত অর্জনের প্রবক্তা ছিলেন। এমনকি তিনি স্বীয় (লিখিত কিতাব) তারিখ রচনার সূচনা নবী কারীম (সা.)-এর কবরের পাশে বসে করেছেন। তিনি নিজেই বলেন,

ثم صنفت التاريخ فى المدينة عند قبر النبى ﷺ (مقدمة فتح البارى ص٤٧٨)

অর্থাৎ আমি আমার 'তারিখের' সূচনা মদীনা শরীফে নবী কারীম (সা.)-এর রওজার পাশে করেছি।

আজকালের 'গাইরে মুকাল্লিদ' গোষ্ঠী তো বুজুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্য অবলম্বন করত তাদের থেকে উপকৃত হওয়াকে হারাম মনে করে। অথচ ইমাম বোখারী (রহ.) এজাতীয় বরকত অর্জনকে জায়েয বলেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) লেখেন :

وكان معه شئ من شعر النبى ﷺ فجعله فى ملبوسه۔

অর্থাৎ : ইমাম বোখারী (রহ.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু চুল মোবারক ছিল, সেগুলো তিনি স্বীয় কাপড়ে রাখতেন। সারসংক্ষেপ যদি ইমাম বুখারী (রহ.) গাইরে মুকাল্লিদ হয়েও থাকেন, তবে এ যুগের গাইরে মুকাল্লিদদের মতো নন, তার মাযহাব এ যুগের গাইরে মুকাল্লিদদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিল।

## ইবনে তাইমিয়া (রহ.) কি তাকলীদবিরোধী ছিলেন?

মোহতারাম হযরত মাও. আবু বকর গাজীপুরী (পরিচালক মাসিক যমযম)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি, ভালো আছেন। "রদ্দে গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের" ক্ষেত্রে আপনার কিতাব পড়ার তৌফিক হয়েছে এবং এখন অনেক গুরুত্বের সাথে 'যমযম' অধ্যয়ন করছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন।

আমাদের এ অঞ্চলে বহুসংখ্যক লোক আহলে হাদীস মতবাদের প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়েছে। আপনার লিখিত কিতাব এবং 'যমযম' অধ্যয়ন করে আলহামদুল্লিাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আহলে হাদীস মতবাদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এবং প্রভাব বিস্তারকারীদের প্রভাব দূরীভূত হয়েছে। "লম্হায়ে ফিক্রিয়া" ও "সাবিলুল রাসূল পর এক নজর" কিতাবদ্বয় অত্যন্ত মনোরম। এবং 'আয়নায়ে গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাত' থেকে তাদের আকীদা প্রসঙ্গে ইল্ম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার সুস্থ ও নেক হায়াত দ্বারায করুন এবং হিংসুকদের হিংসা থেকে, অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে সর্বাবস্থায় হেফাজত করুন।

হযরত ওলা! শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে সম্প্রতিক গাইরে মুকাল্লিদের বক্তব্য হলো, তিনি নাকি তাকলীদের অস্বীকারকারী ছিলেন! এবং তাঁর মাযহাব ও আকীদাও নাকি বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদদের মতো ছিল। এ বক্তব্যের সত্যতা ও বাস্তবতা কতটুকু? অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে অবগত করলে উপকৃত হতাম।

ওয়াস্সালাম

অধম

মহিউদ্দীন (বিহার)

**উত্তরঃ** শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি তাকলীদের অস্বীকারকারী ছিলেন, এটা চরম পর্যায়ের অজ্ঞতার কথা। কোনো গায়রে মুকাল্লিদ তা দলিলভিত্তিক প্রমাণ করতে পারবে না। তাঁর ত্রিশোর্ধ খণ্ডবিশিষ্ট ফাতাওয়ার কিতাব এ কথার প্রমাণ বহন করে যে তিনি ফিকহী মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম চতুর্দ্বয়ের উক্তির মাধ্যমে দলিল প্রদান করেন এবং তাদের মাযহাবের ওপর স্বীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে তিনি স্বাভাবিক তাকলীদের অস্বীকারকারী ছিলেন এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি কোনো এক ইমামের মতামত অবলম্বন করতেন। এমনটা করার তাঁর অধিকার ছিল। কারণ তিনি ইল্‌ম ও ফজীলতের এমন আসনে আদিষ্ট ছিলেন! যেকোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল না। তবে যেহেতু তিনি মুজতাহিদে মুতলাক' ছিলেন না, তাই তিনি সাধারণ মাসআলায় 'ইজতেহাদ' করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যেখানে ইজতেহাদ করার হিম্মত দেখিয়েছেন, উম্মতে মুসলিমা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি আইম্মায়ে আরবা'আ (ইমাম চতুর্দ্বয়)-এর বিপরীত ইজতেহাদ করেছেন যে একই বৈঠকে তিন তালাক এক তালাকই বলে গণ্য হবে। উম্মতে মুসলিমার হাতে গোনা মুষ্টিমেয় বিচ্ছিন্ন কিছু স্বাধীনমনা ব্যক্তি ব্যতিরেকে সর্বসম্মতিক্রমে তার এই ইজতিহাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ইবনে তাইমিয়ার এ ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যাত বলে পরিগণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়্যাতে সফর করা হারাম বলেছেন। উম্মতে মুসলিমা এ মতামতকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু কি তাই! তাঁর এমন ইজতেহাদ চরম পর্যায়ের নিন্দনীয় বলে আখ্যা পেয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন :

وهى من ـــــ المسائل المنقولة عن ابن تيمية ٣/٦٦)

অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়া যেসব বিচ্ছিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে এটি অধিকতর জঘন্যতম ও নিন্দনীয়। তিনি আরো বলেন :

فانها افضل الاعمال واجل القربات الموصلة الى ذى الجلال وان مشروعيتها محل اجماع بلانزاع (ايضا)

অর্থাৎ হুজুর আকরাম (সা.)-এর রওজা যিয়ারত উত্তম আমলসমূহের মধ্য থেকে। এবং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যের কাজ। এটা তো এমন আমল, যা বান্দার মাবুদ পর্যন্ত পৌঁছার সেতুবন্ধ রচনাকারী। তাছাড়া কবর যিয়ারতের মাসআলায় উম্মতে মুসলিমা মতানৈক্যহীন সর্বসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

সর্বোপরি (আমরা বলব) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া সাধারণত ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয়ের সীমা অতিক্রম করতেন না। বরং তাঁদের উক্তিসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করতেন এবং তার ওপরই ফাতাওয়া দিতেন। যদি কখনো কোথাও ইজতেহাদের দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তাহলে রাহে হক থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছেন। উম্মতে মুসলিমা তার এমন মত গ্রহণ করা থেকে সদা বিরত থেকেছেন।

এতটুকু থেকেই অনুমান করা যায় যে, ইজতেহাদের দাবি করা কত দুঃসাধ্য একটি বিষয়। মুজতাহীদ হওয়া কোনো ছেলেখেলা নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মতো এমন মহান ব্যক্তিত্বেরও এ মাকাম অর্জিত ছিল না। তাহলে আমি-আপনার অবস্থান কোথায়?

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

(এটা মহান প্রভুর করুণা, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।)

গাইরে মুকাল্লিদদের হযরত ইবনে তাইমিয়ার জন্য যে মুহব্বত উথলে ওঠে তার বাস্তবতা এতটুকুই যে তিনি তাদের প্রবৃত্তি অনুসারের কিছু বিচ্ছিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, যা কিনা উম্মতে মুসলিমা সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম চতুষ্টয়সহ সকল ফুহাকা ও মুহাদ্দিসীনের বিপক্ষে ইবনে তাইমিয়ার সেই বিচ্ছিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণীয় ও পথপ্রদর্শক মনে করে। উদাহরণস্বরূপ গাইরে মুকাল্লিদদেরও এ মাযহাব যে এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাকই পতিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়্যাতে সফর করা হারাম, ইবনে তাইমিয়ার মাযহাব হলো আল্লাহ তা'আলার জন্য 'জিহাত' (দিক) রয়েছে। সাম্প্রতিক গাইরে মুকাল্লিদদেরও এমনটি মতামত অথচ জমহুরে উম্মাহ তা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুরূপভাবে ইবেন তাইমিয়ার যে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য মাসায়েলগুলো রয়েছে বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদদের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে তাতে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। কিন্তু শরীয়তের অধিকাংশ মাসআলার ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার পথ ও মত বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদদের

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চিঠির উত্তরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা তো সম্ভব নয়, তার পরও এ বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করব, যা ইবনে তাইমিয়া ও বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদদের মাঝে মতাদর্শিক ভিন্নতার মাঝে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করবে। সাথে সাথে গাইরে মুকাল্লিদদের দাবি যে তারা ইবনে তাইমিয়ার পথ, মত ও আকীদার ওপর রয়েছে তার অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করবে।

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট জুমু'আর আযান সুন্নাতে উসমানী। অতএব এর অস্বীকারকারী সরাসরি সুন্নাতে সাহাবার অস্বীকারকারী। অথচ এই আযান গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট শরীয়তসম্মত ও সুন্নাত নয়।

২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট বিশ রাকাত তারবীহ সুন্নাত তথাপি ওমর (রা.) থেকে তা উম্মতে মুসলিমার নিরবচ্ছিন্ন আমল। এমনকি বিশ রাকাতের ওপর সাহাবায় কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদরা বিশ রাকাত তারাবীর বিরুদ্ধে ঝড় তুলেছে।

৩. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট মুক্তাদির জন্য জেহরী নামাযে (উচ্চস্বরে তেলাওয়াতকৃত নামায) সূরা ফাতেহা পড়া জায়েয নেই। বরং নিশ্চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে ইমামের তেলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বর্তমান গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট উচচস্বরে তেলাওয়াতকৃত নামাযেও মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব।

৪. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট বিশেষ প্রয়োজন বোধে নফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয নামায আদায়কারীর নামায হয়ে যাবে। অথচ গাইরে মুকাল্লিদরা ঢালাওভাবে তা বৈধ মনে করে।

৫. শায়খুল ইসলামের নিকট ইমামতির বেশি হকদার হলো উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সবচেয়ে মাসায়েলে নামায সম্পর্কে অবগত রয়েছে, অথচ গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট ইমামতির বেশি হকদার হলো 'আকরা'আ তথা যে কোরআন বেশি শুদ্ধ করে পড়তে পারে।

৬. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের আমল/কর্মপদ্ধতি সুন্নাত অথচ গাইরে মুকাল্লিদরাই তা অস্বীকার করে।

৭. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিকট বিবাহের পর শুধুমাত্র খুলওয়াতে সহীহা (স্বামী স্ত্রীর নির্জনবাস) মহর ওয়াজিব হয়। অথচ গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট মহর ওয়াজিবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত আরো কিছু লাগবে।

৮. গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তির গায়েবী নামাযে জানাযা পড়া হবে। অথচ ইবনে তাইমিয়ার নিকট শুধুমাত্র ওই ব্যক্তির জানাযা পড়া হবে, যার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যাবে যে তাকে জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়েছে।

৯. গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট শুধুমাত্র দুই ব্যক্তির (একজন ইমাম, আরেকজন মুক্তাদি) মাধ্যমে জুমু'আ আদায় সহীহ হয়ে যাবে। অথচ ইবনে তাইমিয়ার নিকট এমনটি সহীহ হবে না।

১০. গাইরে মুকাল্লিদদের কিতাব উরফুল জাভীতে উল্লেখ হয়েছে শরাব যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিরকা হয়ে যায় তাহলে তা জায়েয অথচ ইবনে তাইমিয়া এমন বলেননি, বরং তা নাজায়েয বলেছেন।

আমি বলেছিলাম চিঠিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তার পরও تلك عشرة كاملة দশটি উদাহরণ পূর্ণ হলো। এ থেকে খুব সহজভাবেই অনুমান করা যায় যে তাদের এ দাবি কতটা অবান্তর ও অযৌক্তিক যে তাদের পথ, মত ও আকীদা ইবনে তাইমিয়ার মতো।

*(নুরুদ্দীন নুরুল্লাহ আজমী আরজ করেন যে মাও. গাজীপুরী গায়রে মুকাল্লিদ ও ইবনে তাইমিয়ার মাঝে বাস্তবিক পক্ষে আকীদাগত ও মাযহাবগত যে মতপার্থক্যের উদাহরণগুলো পেশ করলেন তাতে সূত্র রেফারেন্স যোগ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে স্বয়ং ইবনে তাইমিয়ার কথার মাধ্যমেই উদাহরণগুলো সূত্রায়িত করা।*

*১. কানযুল হাকায়েক পৃ. ২৬ ইবনে তাইমিয়া বলেন, উসমান (রা.) এ আযান সুন্নাত হিসেবে জারি করলেন এবং তাতে সকল উম্মতে মুসলিমা ঐকমত্য পোষণ করলেন। অতএব এখন তা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত সমর্থিত। (মিনহাযুস সুন্নাহ-৪/১৯৩)*

*২. ইবনে তাইমিয়া বলেন, "জনমনে তারাবীহর রাকাতসংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ওবাই ইবনে কা'আব থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে তিনি বিশ রাকাত তারাবীহ পড়াতেন, সাথে তিন রাকাত বিতর পড়াতেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই সুন্নাত হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি আনসার-মুহাজির সকলের সামনে বিশ রাকাত তারাবীহ পড়িয়েছেন। কেউ তাতে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। (ফাতাওয়া-২৩/১১৩)*

*৩. উচ্চস্বরে তেলাওয়াতকৃত নামাযে মুক্তাদির নিশ্চুপ থাকাও মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত শ্রবণ করা সম্পর্কে কোরআনে অকাট্য দলিল বিদ্যমান*

*রয়েছে। (ফাতাওয়া-২৩/২৭২)*

*৪. দ্রষ্টব্য (ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম-২২/২৪৮)*

*৫. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যদি দুই ব্যক্তি হয় এবং দুজনেই দ্বীনদার হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে কিতাব ও সুন্নাহর সম্পর্কে অধিকতর অবগত রয়েছে তাকেই ইমামতির জন্য সামনে দেওয়া হবে। (ফাতাওয়া-২৩/২৪১)*

৬. *ইবনে তাইমিয়া বলেন,*

فسنة الخلفاء الراشدين هى مما امر الله به ورسوله وعليه ادلة شرعية كثيرة (الفتاوى ٤/١٠٨)

*অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আমলযোগ্য হওয়ার নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অসংখ্য দলিল বিদ্যমান রয়েছে।*

৭. *নবাব সাহেব ভুপালী বলেন,*

نيست دليل پر وجوب مهر كامل بمجرد خلوت ، وتمسك بغير دليل حلال نيست (عرف الجادى ١٠٦)

*অর্থাৎ : শুধুমাত্র ....(যৌন সম্ভোগের নির্জনতা)-এর মাধ্যমেই মহর ওয়াজিব হয়ে যায় এর সপক্ষে কোনো দলিল নেই। আর ভিত্তিহীন কথার মাধ্যমে দলিল পেশ করা আদৌ বৈধ হতে পারে না।*

*পক্ষান্তরে ইবনে তাইমিয়া বলেন,*

بل عليه كمال المهر كما قال زاده وقضى الخلفاء الراشدون والائمة المهديون (الفتاوى ٣٢/١٩٧)

*অর্থাৎ স্বামীর ওপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। যেমনটি খোলাফায়ে রাশেদীন ও ইমামগণ ফায়সালা করেছেন।*

৮. *ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) ইবনে তাইমিয়ার সূত্রে উল্লেখ করেন, সত্য কথা হলো যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো শহরে হারিয়ে যায়, যেখানে তার জানাযা পড়া হয়নি, তাহলে তার গায়েবী জানাযা পড়া হবে.... কিন্তু যার জানাযা ইতিমধ্যে পড়া হয়েছে, তার গায়েবী জানাযা পড়া হবে না। (যাদুল মা'আদ-১/৫২০)*

৯. *দ্রষ্টব্য (ফাতাওয়া-২৪/১৮৭)*

১০ *উরফুল জাভীতে উল্লেখ রয়েছে,*

سركه ساختن خمر ناردا استاگر از خود سركه گردد جائز باشد۔

*অর্থাৎ শরাবের সিরকা বানানো জায়েয নেই। তবে যদি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিরকা হয়ে যায়, তবে জায়েয হবে।*

*ইবনে তাইমিয়া বলেন,*

قيل لايجوز بحال وهذا هو الصحيح۔

*অর্থাৎ : শরাবের সিরকার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে যে তা কোনো পদ্ধতিতেই জাযেয হবে না এবং এটাই প্রণিধানযোগ্য মতামত।)*

---

***৩ পৃষ্ঠার পর :***

ভয়প্রদর্শক পৌঁছেনি বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জিল অবিকৃত অবস্থায় ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনি অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল।

ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারও কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

**শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত :**

আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা.) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে এ কথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোনো আলো ছিল না। আল্লাহর সৃষ্ট মানব আল্লাহর সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংস্বর্গের কল্যাণে ও নবুওয়াতের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যে এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোনো চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষু রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে কারও মনে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সব মুজিযা একদিকে রেখে একা এ মুজিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

# মুসাফিরের নামায

মুফতি শরীফুল আজম

**সফরে আযান-ইকামত :**

একাধিক মুসাফির জামাতের সাথে নামায আদায়ের সময় আযান এবং ইকামতের সাথে জামাত করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হলো ওই স্থানে আযান নিষিদ্ধ না হওয়া এবং কোনোরূপ ফেতনা-ফ্যাসাদ বা বিদ্রুপের সম্মুখীন না হওয়া। যদি বিনা ওজরে আযান ছেড়ে শুধু ইকামত দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও উভয়টি ছেড়ে দেওয়া অনুত্তম।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ :إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِى أَرْضٍ قَىٍّ، فَتَوَضَّأَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، تَيَمَّمَ، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُقِيمُهَا، ثُمَّ يُصَلِّيهَا، إِلَّا أُمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ صَفًّا -قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَزَادَنِي سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ :يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِ (سنن كبرىٰ [نسائى] ١١٨٣٥)

وكره تركها لمسافر ولو منفردا ، وكذا تركها لا تركه، الظاهر ان المراد نفى الكراهة الموجبة للاساءة (شامى ١/٢٩٠)

শরয়ী সফরের দূরত্বে গমন করা হোক বা এর চেয়ে কম দূরত্বে, সফরসঙ্গীরা সকলে উপস্থিত থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় আযান দেওয়া মুস্তাহাব। তাই জামাতের সাথে নামায পড়তে হলে আযান দিতে হবে।

**যানবাহনে আযান :**

চলন্ত যানবাহনে জামাতের সাথে নামায পড়তে চাইলে আযান-ইকামত দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন ট্রেন, বিমান অথবা লঞ্চে চলাচলের সময় হয়ে থাকে। ট্রেনের এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাতায়াত সম্ভব হলে এক আযান সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। অন্যথায় পৃথক পৃথক আযান দিতে হবে।

(আহসানুল ফাতাওয়া-২/২৯৪)

**মুসাফিরের আযান-ইকামত :**

মুসাফির হোক বা মুকিম উভয়ের জন্য আযান-ইকামত দেওয়ার অনুমতি আছে। হযরত মালেক বিন হুয়াইরিস (রা.) বলেন, আমি এবং আমার চাচাতো ভাই নবীজির (সা.) খেদমতে হাজির হলাম। বিশ দিন পর ফিরে আসার প্রাক্কালে তিনি বললেন,

সফরে আযান এবং ইকামত দেবে আর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে। (তিরমিযী শরীফ, হা. ২০৫))

عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ :قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لَنَا :إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا الأَذَانَ فِي السَّفَرِ

উল্লেখ্য যে ফাসেক, ফাযের এবং বিদ'আতীর আযান সর্বাবস্থায় মাকরূহ। (শামী-১/২৮৯)

**নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা :**

**আসরের নামায :**

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় প্রতিটি জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর থেকে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ছায়া এক গুণ পার হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হানাফীগণ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কথার ওপর সর্বদা আমল করে থাকে। তবে মুসাফিরের জন্য এখানে কিছুটা ছাড় রয়েছে। সফরের সময়সূচি যদি এমন হয় যে ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত আসরের অপেক্ষা করতে গেলে যানবাহন ছেড়ে দেবে অথবা সফরের মাঝে ওয়াক্ত মতো নামায আদায়ের সুযোগ হবে না। বরং কাযা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে এমন পরিস্থিতিতে ছায়া এক গুণ পার হতেই আসরের নামায পড়ে সফর আরম্ভ করতে পারবে।

قال فى البحر لايعدل عن قول الامام الى قولهما او قول احدهما الا لضرورة۔ (شامى ١/٢٦٤)

উল্লিখিত অপারগতা ছাড়া শুধুমাত্র বাড়তি সুবিধার জন্য বা সফরে সহুলতের জন্য জোহর-আসর জমা করার অবকাশ নেই। কাজেই কেহ যদি এক গুণ ছায়া হতেই আসর পড়ে নেয় তার নামায হবে না। পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি জোহরকে ইচ্ছাকৃত পিছিয়ে আসরের ওয়াক্তে একসাথে পড়ে, তাহলে জোহরের নামায কাযা হিসেবে আদায় হবে। তবে গুনাহগার হবে। অন্যান্য নামাযের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য।

ولا يجمع بين فرضين بعذر سفر او مطر (در مختار ١/٢٨١)

**দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া :**

সফর বা বৃষ্টির কারণে দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্রে এক ওয়াক্তে পড়ে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা পবিত্র কোরআনে নামাযকে তার ওয়াক্ত মতো আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

ان الصلوٰة كانت على المؤمنين كتبًا موقوتا۔

নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা আন নিসা-১০৩)

কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে তার ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাই ওয়াক্ত মতো নামায না পড়া কবীরা গোনাহ। যা সফর বা বৃষ্টির ওজরে বৈধ হতে পারে না। যেমন অন্যান্য কবীরা গোনাহ ওই ওজরে বৈধ হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ

যে ব্যক্তি দুই নামায এক ওয়াক্তে জমা করল সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হলো। (তিরমিযী, হা. ১৮৮)

**ফকীহগণের অভিমত :** বিষয়টি ইজতিহাদনির্ভর হওয়ায় হিজায ও ইরাকের মুজতাহিদগণের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেছে, হওয়াটা স্বাভাবিক।

'আইম্মায়ে সালাসা' ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ও মালিক (রহ.)-এর মতে, ওজর সাপেক্ষে জোহর ও আসর, মাগরিব ও এশা একসঙ্গে আদায় করা জায়েয। তবে ইমাম আহমাদ (রহ.) সফর, বৃষ্টি ও রোগের প্রত্যেকটি, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রথমোক্ত দুটি এবং ইমাম মালেক (রহ.) কেবল প্রথমটি ওজর হিসেবে বিবেচনা করেন।

আবার তাঁদের মতামতের সারকথা এক হলেও পদ্ধতি ও পরিস্থিতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.)-এর মতে, জামায়ে তাকদিম তথা জোহরের সময় জোহর ও আসর এবং মাগরিবের সময় মাগরিব ও এশা একসঙ্গে আদায় করা যেমন জায়েয, তেমনি জমায়ে তাখির তথা আসরের সময় জোহর ও আসর এবং এশার সময় মাগরিব ও এশা একসঙ্গে আদায় করাও জায়েয।

অনুরূপ সফরের ক্ষেত্রেও অনবরত সফর হোক বা ধাপে ধাপে, ব্যতিব্যস্ত সফর হোক বা ধীরে-সুস্থে, মোটকথা ওজর সাপেক্ষে সর্বাবস্থায় জমা বাইনাস সালাতাইন (পরবর্তীতে কোথাও কোথাও শুধু জমা উল্লেখ করা হবে) বা দুই ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে আদায় করা জায়েয।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, অবিরাম ও ব্যতিব্যস্ত সফরে জমায়ে তাকদিম তাখির উভয়টা জায়েয। অন্যথায় কোনোটিই জায়েয নয়। তাঁর আরেকটি দুর্বল অভিমত হলো, শুধু জমায়ে তাখির জায়েয, জমায়ে তাকদিম জায়েয নেই।

হানাফী মতাবলম্বীদের মতে, স্বাভাবিক অবস্থায় জমায়ে তাকদিম তাখির উভয়টাই নাজায়েয। হ্যাঁ, অনন্যোপায় হলে জমায়ে তাখির তথা প্রথম ওয়াক্তের নামায দেরি করে পরবর্তী ওয়াক্তে উভয় নামায একসঙ্গে আদায় করার সুযোগ আছে। তাঁদের সপক্ষে দলিল হলো,

ان الصلوٰة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা আন নিসা-১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক নামায স্বীয় ওয়াক্তে আদায় করা জরুরি। এখানে উল্লেখ্য, হজের মৌসুমে আরাফা ও মুযদালিফায় জমা বাইনাস সালাতাইন আহনাফসহ উম্মতে মুহাম্মাদির সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। কেননা হুজুর (সা.) থেকে অদ্যাবধি যুগ পরম্পরায় এভাবেই আদায় করা হচ্ছে; এটা তাওয়াতুরের উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর তাওয়াতুর দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় কোরআনের সাথে বৃদ্ধি করা জায়েয। একইভাবে ওজর থাকলে জমায়ে তাখিরও জায়েয। যেমন ট্রেন বা বিরতিহীন বাসযোগে যাত্রাকালে অথবা বাসে অত্যধিক ভিড়, নামায পড়া সম্ভব নয়–এজাতীয় ওজরের ভিত্তিতে প্রথম ওয়াক্তের নামায দেরি করে পরের ওয়াক্তে একসঙ্গে আদায় করা যাবে।

এমতাবস্থায় প্রথম ওয়াক্তের নামায 'কাযা' এবং পরের ওয়াক্তের নামায 'আদা' হিসেবে গণ্য হবে।

এতে প্রতীয়মান হয়, আপাতপক্ষে জমা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা জমা বাইনাস সালাতাইন নয়।

হানাফীদের মতে, কোনো অবস্থাতেই জমায়ে তাকদিমের সুযোগ নেই, করলে ওই ওয়াক্তের নামায আদায় হবে কিন্তু অপর ওয়াক্তের নামায তার যিম্মায় থেকে যাবে।

এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে তিন ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**প্রথমত :** ওই সকল হাদীস, যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে হজুর (সা.) সফরকালে জমায়ে সুরি (جمع صورى) করতেন। অর্থাৎ এক নামায তার শেষ ওয়াক্তে, অপর নামায তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন। উভয় নামাযই স্ব-স্ব ওয়াক্তে আদায় করা হতো, যদিও দৃশ্যত তা জমা মনে হয়। এজন্যই তা জমায়ে সুরি বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একত্রীকরণ নামে খ্যাত। ওজর থাকলে সকলের ঐকমত্যে এভাবে আদায় করা জায়েয।

**দ্বিতীয়ত :** ওই সকল হাদীস, যেখানে স্পষ্ট জমায়ে হাকিকির (جمع حقيقى) কথা আছে। জমায়ে হাকিকির আরেক নাম জমায়ে ওয়াক্তি।

**তৃতীয়ত :** ওই সকল হাদীস, যেখানে জমায়ে হাকিকি না সুরি, তা অস্পষ্ট। এ ধরনের হাদীসই সংখ্যাধিক। এ সকল হাদীসে শুধু উল্লেখ আছে হুজুর (সা.) দুই ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে আদায় করতেন। সেখানে না আছে জমায়ে হাকিকি বা সুরির কথা, না আছে বিশদ বিবরণ।

এ ধরনের হাদীস আমাদের আলোচনাবহির্ভূত। কারণ আইম্মায়ে সালাসা এর দ্বারা জমায়ে হাকিকি আর হানাফীগণ জমায়ে সুরি সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপ প্রথম প্রকারের হাদীসও আলোচনাবহির্ভূত, এজন্য যে জমায়ে সুরি সকলের ঐকমত্যে জায়েয।

আর যে সকল হাদীসে জমায়ে হাকিকির কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে তন্মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সনদের বিচারে শক্তিশালী হলো হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস; যা ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ

حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ (ترمذی ٥٥٢)

হুজুর (সা.) তাবুক যুদ্ধে সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করলে জোহরের নামায দেরি করে আসরের সঙ্গে আদায় করতেন এবং উভয় নামায আসরের ওয়াক্তে আদায় করতেন। সূর্য ঢলার পর সফর করলে জোহরের সময় জোহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন।

আর সূর্যাস্তের পূর্বে সফর করলে মাগরিবের নামায দেরি করে এশার সঙ্গে এশার ওয়াক্তে আদায় করতেন, সূর্যাস্তের পর সফর করলে মাগরিবের সময় মাগরিব ও এশা একসঙ্গে আদায় করতেন।

**ব্যাখা :** এই হাদীসটি হযরত কুতাইবা (রহ.) লাইস বিন সাদ, ইয়াযিদ বিন আবি হাবিব, আবু তুফাইল, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই একমাত্র সনদ।

এখানে হযরত কুতাইবা, লাইস বিন সাদ ও ইয়াযিদ বিন হাবিব উচ্চ পর্যায়ে বিশ্বস্ত রাবী এবং হাদীসের ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত। আর আবু তুফাইল ও মু'আয (রা.) সাহাবী। অর্থাৎ হাদীসটির মাকাম বা অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী।

কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই সনদ ও মতনকে শায আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণের (হাদীস বিশারদ) নিকট হাদীসটি না তো ইয়াযিদ বিন হাবিবের সূত্রে মারুফ না তো হাদীসটির এই মতন মারুফ। বরং হাদীসটি আবু যুবায়ের, আবু তুফায়েল, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) সূত্রে মারুফ।

আর আবু যুবায়ের থেকে বর্ণনাকারীরা হলো কুরবা বিন খালিদ, সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক (রহ.) ও অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ। ওই হাদীসের মারুফ মতন হলো,

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বলেন, হুজুর (সা.) তাবুক যুদ্ধে জোহর ও আসর, মাগরিব ও এশা একসঙ্গে আদায় করেছেন।... অর্থাৎ মূলত হাদীসটি মুজমাল। আর ইয়াযিদ বিন হাবিবের সনদে যে দীর্ঘ মতন আছে তা মাহফুয বা সংরক্ষিত নয়।

অন্যান্য হাদীসের ইমামগণও ওই হাদীসের ব্যাপারে সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী মতামত দিয়েছেন।

হাকিম আবু আব্দুল্লাহ (মুসতাদরাক গ্রন্থ প্রণেতা) হাদীসটি মাওযু, ইমাম আবু দাউদ 'মুনকার' আর ইবনে হাযেম যাহেরী 'মুনকাতি' বলেছেন।

ইমাম বোখারী (রহ.) বলেন, আমি কুতাইবাকে জিজ্ঞাসা করলাম যখন আপনি হাদীসটি লাইস বিন সাদের কাছে পড়ে ছিলেন, তখন আপনার পাশে কে বসে ছিল? উত্তরে তিনি খালিদ মাদায়েনীর কথা বললেন। ইমাম বোখারী বললেন, চুরি ধরা পড়ে গেছে, খালিদ মাদায়েনী তার উস্তাদদের হাদীসে পরিবর্ধন-পরিমার্জন করত এই হাদীসে যে অতিরিক্ত অংশ তা কুতাইবার অগোচরে খালিদ সন্নিবিষ্ট করেছে। অন্যথা হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে মুজমাল।

আবার ইবনে হিব্বানসহ অপরাপর কিছু হাদীসবিদ হাদীসটি সহীহ বলেও মত ব্যক্ত করেছেন।

মোটকথা, হাদীসটির ব্যাপারে সহীহ-জঈফ উভয়পক্ষে মতামত থাকলেও কুতাইবা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ মতনে হাদীসটি 'গাইরে মাহফুয বা অসংরক্ষিত, যা দলিল হিসেবে উত্থাপন করা যায় না।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত মুজমাল হাদীস মুসলিম শরীফে এবং এ ব্যাপারে ইমামদের বিস্তারিত মতামত মা'আরিফুস সুনান-৪/৪৮৩ দ্রষ্টব্য।

(তুহফাতুল আলমারী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী-২/৪৩২-৪৩৫।

**কিবলামুখী হওয়া :**

নামাযে অন্যতম প্রধান ফরয হচ্ছে কিবলামুখী হওয়া। এই ফরযটি ছুটে গেলে নামায শুদ্ধ হবে না। মুসাফির যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় হোক বা কোথাও স্থির অবস্থায় কিবলামুখী না হলে তার নামায হবে না। কিবলামুখী হওয়া তার জন্য জরুরি। কিবলার দিক জানা না থাকলে কারো কাছে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। না জেনে নামায আদায় করা জায়েয হবে না। এমন কাউকে না পেলে চাঁদ-তারার সাহায্যে অথবা কম্পাসের সাহায্যে কিবলা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে। তাও সম্ভব না হলে খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে যেদিকে প্রবল ধারণা হয় সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। এভাবে চেষ্টা করে কিবলা নির্ণয় করে নামায আদায়ের পর যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু চেষ্টা ব্যয় করা ছাড়া যদি এমনিতেই একদিকে ফিরে নামায আদায় করে নেয়, তাহলে নামায হবে না। হ্যাঁ, পরে যদি সেটা সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে নামায শুদ্ধ বিবেচিত হবে। তদ্রুপ যদি কিবলা জেনে নেওয়ার কোনো উপায় থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে কিবলা ঠিক করে, তাহলে বাস্তবেই সেটা কিবলা হয়ে থাকলে নামায হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وان اخطا لم يعد وان علم به فى صلوته استدار (البحر الرائق ٢٨٨/١)

সাধ্যানুযায়ী চিন্তা-ফিকির করত কিবলা ঠিক করে নামায শুরু করার পর নামাযের মাঝে যদি তা ভুল বলে প্রকাশ পায়, তাহলে নামাযে থাকাবস্থায় কিবলার দিকে ঘুরে যেতে হবে।

فَأَمَّا إِذَا صَلَّى إِلَى جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ بِالتَّحَرِّي ثُمَّ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَسْخُ الْقِبْلَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ اسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ وَأَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْإِعَادَةِ (بدائع الصنائع ٥٥١/١)

# নারীদের ভয়ংকর দশটি গোনাহ

মুফতী আবদুর রহমান এযাযী

**১. স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া**

বর্তমানে সামান্য ও তুচ্ছ কারণে অনেক নারী স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসে। হয়তো স্বামীর কাছে কোনো কিছু চায় কিন্তু কোনো কারণে স্বামী যদি তা দিতে সক্ষম না হয় তখনও সে তালাক চায়। শুধু তা-ই নয়, কখনো কখনো স্বামীকে উত্তেজনামূলক কথাও বলা হয়। যেমন বলে, যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাকো তাহলে আমাকে তালাক দাও ইত্যাদি। এভাবে স্ত্রীর জন্য তালাক চাওয়া মারাত্মক গোনাহ। এতে বিভিন্ন সমস্যা ও ফেতনার সৃষ্টি হয়। যেমন সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন হওয়া, সন্তানরা ঘরছাড়া হওয়া ইত্যাদি। দেখা যায় উক্ত নারী পরবর্তীতে লজ্জিত হয়ে থাকে যদিও তখন ওই লজ্জা কোনো কাজে আসে না।

হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে মহিলা (শরয়ী) কোনো কারণ ব্যতীত তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তার ওপর জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম। (আবু দাউদ : হাদীস নং-২২২৬)

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই খোলা ও তালাক গ্রহণকারী নারীরা হলো মুনাফেক। (তবারানী : ১৭/৩৩৯) আর মুনাফিকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। (সূরা নিসা : ১৪৫)

অবশ্য যদি কোনো শরয়ী কারণ থাকে, যেমন স্বামী নামায পড়ে না, নেশা করে, স্ত্রীকে হারাম কাজ করতে বাধ্য করে অথবা মহিলার শরয়ী হক আদায় না করে ইত্যাদি এবং ওই ব্যাপারে স্বামীকে নসিহত করলেও তা কোনো উপকারে আসে না। সে ক্ষেত্রে মহিলা নিজের নফ্স এবং দ্বীনকে হেফাজত করার স্বার্থে উক্ত জালেম স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইতে পারবে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যা আমাদের সমাজে রীতিমতো মহামারির আকার ধারণ করেছে। আর তাহলো, এক শ্রেণীর নারী এ ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। তারা স্বামীর কাছে তালাক চায় না বরং সামান্য বিষয়ে স্বামীকেই ডিভোর্স দিয়ে দেয় এবং ডিভোর্স দেওয়ার দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে আরেক স্বামী জোগাড় করে নেয়। যা স্পষ্টত হারাম, কবীরা গোনাহ ও ব্যভিচারের শামিল। খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে, স্ত্রী চাইলেই স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য বিবাহ করতে পারে না। হ্যাঁ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা কোনো শর্তের সাথে (বা শর্তহীন) দেয় এবং সেই শর্ত পাওয়া যায় তখন স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে এবং তালাকের ইদ্দত গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব অন্যথায় তিন হায়েয-পিরিয়ড অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে এর আগে নয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর তালাক গ্রহণ সহীহ হয় না। আবার হলেও অন্য স্বামী গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করে। তালাক আজ দিয়ে পূর্বের তারিখ দেয় এবং নতুন বিবাহ করে ফেলে, যা নিকৃষ্ট গোনাহ ও হারাম। আবার অনেক স্বামী আছে স্ত্রীকে মৌখিক তিন তালাক দেয় স্ত্রীও জানে তার পরও তারা ওই অবস্থায় সংসার করে। বাহানা করে বলে, আমি তো মন থেকে তালাক দিইনি, মুখে তালাক দিলে হয় না বা এক কথায় তিন তালাক দিলে হয় না বা একসাথে তিন তালাক দিলে হয় না ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, স্বামী যদি তিন তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি তা নিশ্চিতভাবে শুনে থাকে বা জেনে থাকে তাহলে অভিজ্ঞ আলেমের ফয়সালা ছাড়া নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করা গোনাহ ও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

**২. সহবাসে স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া**

শরয়ী কোনো ওজর ব্যতীত স্বামীর বিছানায় যেতে অস্বীকৃতি জানানো তথা সহবাস থেকে বিরত থাকা কঠিন গোনাহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহ্বান করে কিন্তু সে সাড়া না দেয়, এতে স্বামী যদি তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাতযাপন করে তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত উক্ত মহিলার ওপর ফেরেস্তারা অভিশাপ দিতে থাকে। (সহীহ বোখারী, হাদীস নং-৩২৩৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার নফস যখনই কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে অথচ সে অস্বীকার করে তাহলে মহান আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় থাকেন, যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (সহীহ মুসলিম, হা: নং ১৪৩৬)

যখন স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে মন-কষাকষি হয়, তখন অনেক নারী স্বামীর শয্যায় যেতে চায় না। এর ফলে অনেক বড় বড় ফেতনার সূচনা হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটা হলো, স্বামী হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া শুরু করে (তথা পরকীয়া এবং অন্যান্য অবৈধ কাজ)। সুতরাং মহিলার জন্য আবশ্যক হলো তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো টালবাহানা বা বিলম্ব না করা। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) বিছানায় ডাকে তখন সে যেন সাথে সাথে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়, যদিও স্ত্রী তখন হাওদায় (উটের ওপর) থাকে। (সহীহুল জামি : ৫৪৭)

স্ত্রীর বর্তমান অবস্থা সামনে রাখাও স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রী যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকে অথবা গর্ভবতী থাকে অথবা দুঃখপীড়িত থাকে তখন তার আগ্রহ ছাড়া শয্যায় না ডাকা। যাতে উভয়ের মাঝে সার্বক্ষণিক মুহাব্বত বজায় থাকে এবং কলহ সৃষ্টি না হয়।

**৩. সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়া**

বিভিন্ন পারফিউম, সেন্ট, সুগন্ধি মেখে রাস্তায় বের হওয়া বর্তমান নারীসমাজের মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, যদি কোনো মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো জাতির (তথা বেগানা পুরুষের) পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে আর সে তার সুগন্ধি পায় তাহলে উক্ত মহিলা যিনাকারিণী বলে বিবেচিত হবে। (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৪১৮)

**৪. মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করা**

নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নাজায়েয। অথচ আমাদের সমাজে এই ব্যাধিও মারাত্মক। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেন, কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে। (সহীহ বোখারী : হাদীস নং-১৭৬৩)

এখানে সফরের দ্বারা সকল প্রকার সফরের কথা বোঝানো হয়েছে। এমনকি হজের মতো একটি বড় ইবাদতও এর মধ্যে শামিল। সফরে মাহরাম পুরুষের প্রয়োজন এই কারণে যে, যদি সে মাহরাম ব্যতীত সফর করে তাহলে ফাসেকরা তার পেছনে পড়তে পারে এবং তার সম্মানহানিও করতে পারে। কিন্তু সে দুর্বল হওয়ার কারণে তার অনিষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

মাহরাম উপযুক্ত হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত আছে। ১. মুসলমান হওয়া। ২. বালেগ হওয়া। ৩. জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। ৪. পুরুষ হওয়া। মাহরাম হলো নারীর বাবা, ছেলে, স্বামী বা তার ভাই। অবশ্য সফরের রাস্তা যদি কসর পরিমাণ (৪৮ মাইল বা সোয়া সাতাত্তর কি:মি:) না হয় তাহলে ফেতনার আশংকা না থাকলে জরুরতের কারণে নিকটে দিনের বেলা সফর করা জায়েয আছে। (মুসলিম, হা: নং-১৩৪০)

**৫. খাটো, পাতলা এবং টাইট পোশাক পরিধান করা**

মাহরাম থেকে নারীদের জন্য মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া অবশিষ্ট পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা ফরয। অনুরূপভাবে গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডলসহ গোটা শরীর ঢিলা কাপড় দ্বারা আবৃত রাখা জরুরি। বর্তমান যুগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মহিলাদের সাথে মুসলিম নারীদের পোশাক একাকার হয়ে গেছে। আজ মুসলিম নারীরাও এমন পোশাক পরিধান করছেন, যার মাধ্যমে সতর পরিমাণও ঢাকে না। উপরন্তু সেগুলো অত্যন্ত পাতলা ও টাইট। তার মধ্যে তো কিছু কিছু পোশাক এমনও আছে, যেগুলো পরিধান করে বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা বরং অন্য মাহরাম এবং মহিলাদের সামনেও পরিধান করা যায় না। সমঅধিকার ও নারী অধিকারের নামে কেউ কেউ তো হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি পরছে। আবার অনেকে স্বামী বা পরিবার থেকে বোরকা পরার চাপ থাকার কারণে এমন টাইট-ফিটিং বোরকা পরছে যাতে শরীরের অঙ্গসমূহ পরিস্ফুটিত হয়ে যায়। ইসলামে এর সবটাই নিষিদ্ধ।

নবীজি (সা.) শেষ যামানার এমন নগ্নজাতীয় পোশাকের আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছেন, দুই ধরনের জাহান্নামীদের আমি এখনো দেখিনি। একদল হলো, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও নগ্ন থাকবে। যারা (অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি) আকর্ষণকারিণী এবং (নিজেরাও অন্যদের প্রতি) আকৃষ্ট। তাদের মাথার চুল হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার খোশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খোশবু পাওয়া যায়। (মুসলিম, হা: নং-২১২৮)

নিষিদ্ধ পোশাকের মধ্যে ওই সব পোশাকও অন্তর্ভুক্ত, যে পোশাকগুলো নিচের দিক থেকে লম্বাভাবে খোলা থাকে অথবা যেগুলো বিভিন্ন দিক থেকে ছেঁড়া-ফাঁড়া থাকে। কেননা এ ধরনের পোশাক পরিধান করে যখন কেউ বসে তখন তার সতর খুলে যায়, সাথে সাথে এগুলো কাফেরদের পোশাকের সাথেও সাদৃশ্য রাখে, যে ব্যাপারে নবীজি (সা.) আমাদের নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুস্থ রুচি দান করুন। আমীন।

**৬. নিজস্ব চুলের সাথে নকল চুল লাগানো**

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে হাম রোগে আক্রান্ত হয়েছে, যার ফলে তার চুল পড়ে গিয়েছে। এখন আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেব?

তখন হুজুর (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিনী নারীদের ওপর লানত করেছেন। (মুসলিম : ২১২২) এবং হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, যে নারী তার মাথায় কোনো কিছু সংযোজন করে রাসূল (সা.) তাকে ধমক দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, হা: নং-২১২৬) অবশ্য ফকীহগণ পরচুলা যদি মানুষের না হয়ে কৃত্রিম হয় তবে তার ব্যবহার জায়েয বলেছেন। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম : ৪/১৯০-১৯১)

**৭. বিউটি সার্জারি-ভ্রু কাটা**

ইসলাম একজন নারীর জন্য যাবতীয় সঙ্গত সৌন্দর্য গ্রহণের পূর্ণ অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্যের নামে কৃত্রিমতা ও সীমালংঘন করে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ কারণে ক্রিম, পাউডার, স্নো ইত্যাদি সৌন্দর্যের উপকরণ ব্যবহার করা জায়েয। কেননা তাতে সৃষ্টির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তাই বলে চেহারায় বয়সের ভারে যে ছাপ পড়ে অপারেশন করে তা

দূর করা, নাক খাড়া করা ইত্যাদি সার্জারি করা জায়েয নেই। কেননা তা সৃষ্টির পরিবর্তন করার শামিল। অনুরূপভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় ও সুন্দরী করতে অনেকে ভ্রু সম্পূর্ণ উপড়িয়ে ছাই দিয়ে ভ্রু বানায়। আবার কখনো ভ্রু কাটছাঁট করে চিকন ও সরু করে রাখে। এমনিভাবে জোড়া ভ্রু কেটে ফাঁকা করে, যা স্পষ্ট সৃষ্টি পরিবর্তন করার শামিল-নাজায়েয। হাদীস শরীফে এমন কাজের ব্যাপারে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। (বোখারী, হা: নং-৫৯৩৯)

**৮. চুলে কালো কলপ লাগানো**

কালো কলপ ব্যবহার করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, শেষ যামানায় একদল লোক এমন হবে, যারা কবুতরের সিনার মতো কালো রঙের খিজাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। (আবু দাউদ : ৪২১২)

বর্তমানে এটা এমন একটা রোগ হয়ে গেছে, যা প্রায় সকল মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে। যাদের মাথার চুলে সামান্য বার্ধক্যের ছোঁয়া লেগেছে তারা কালো কলপের মাধ্যমে সেই শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে ফেলে। মূলত এর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে গোপন করা এবং মূল অবস্থাকে ঢেকে আত্মতৃপ্তি গ্রহণ করা হয়। যা একজন মানুষের জন্য খুবই নিন্দনীয়। হ্যাঁ, বয়সের ভারে চুল না পেকে অন্য কোনো কারণে পেকে থাকলে চুলে কালো কলপ লাগানো জায়েয আছে। তবে ওইটুকু বয়স পর্যন্ত লাগানো যাবে, যে বয়সের মধ্যে সাধারণত চুল পাকে না। এরপর তা ব্যবহার করা জায়েয নেই। আর কালো কলপ বাদে অন্য রং ব্যবহার জায়েয আছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি (সা.)-এর কাছে আনা হলে তখন তার মাথার চুল ও দাড়ি অধিক শুভ্রতার কারণে সাদা ফুলের মতো দেখাচ্ছিল। নবীজি (সা.) বলেন, এর শুভ্রতাকে কালো কলপ ব্যতীত পরিবর্তন করে দাও। (মুসলিম, হা: নং-২১০২)

**৯. বিলাপ করা**

নারীদের বড় নিন্দনীয় ও গোনাহের কাজসমূহের একটি হলো উচ্চস্বরে বিলাপ তথা ক্রন্দন করা। কেউ মারা গেলে তার জন্য নিজের মুখে চড় মারা এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মাথার চুল টানা ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজ দ্বারা মনে হয় কেমন যেন সে তাকদীরের ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট নয় এবং মুসিবতের ওপর ধৈর্যধারণ করতে রাজি নয়। যারা এমন কাজ করে তাদের ওপর আল্লাহর রাসূল লানত করেছেন। হযরত উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) ওই মহিলার ওপর লানত করেছেন যে তার নিজের মুখে থাবা মারে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজের ধ্বংস ও বিনাশ চায়। (ইবনে মাজাহ : ১৫৮৫)

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, বিলাপকারী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোশাক থাকবে। (মুসলিম, হা: নং-৯৩৪)

**১০. অন্য নারীর সাথে কথা বন্ধ রাখা**

শয়তানের পদক্ষেপসমূহের মধ্য হতে একটা পদক্ষেপ হলো, মুসলমানদের মধ্যকার মুহাব্বতকে ছিন্ন করা। সুতরাং যারা শয়তানের অনুসরণ করে তারা পরস্পরে কোনো প্রকার শরয়ী কারণ ব্যতীত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর কখনো কখনো সম্পর্ক ছিন্নতার মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়। আবার কখনো এমন কসম করে বসে যে, অমুকের সাথে আর কথাই বলব না এবং মান্নত করে যে অমুকের বাসায় যাব না এবং যখন রাস্তায় তার সাথে দেখা হয় তখন মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। অথচ এ ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যেকোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়। সুতরাং যে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করল অতঃপর মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ : ৫/২১৫)

মুসলমানদের মধ্যকার মুহাব্বত ছিন্ন হওয়ার বিশেষ একটা খারাপ দিক হলো আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বান্দার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। অতঃপর সমস্ত মুমিন বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়। তবে ওই বান্দাকে মাফ করা হয় না, যার মাঝে ও অন্যের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকে। সুতরাং বলা হয়, তাদের আমলনামাকে ওই অবস্থায় ছেড়ে দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে মারা যায় অথবা আপস করে নেয়। (সহীহ মুসলিম : ১৯৭৭) তাই মুসলমানদের মাঝে পরস্পর কথা বন্ধ রাখা অনেক বড় গোনাহ। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। তবে পুরুষদের তুলনায় তুচ্ছ কারণে কথা বন্ধ রাখার প্রবণতা নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই অপরাধ যার থেকেই হোক তার দায়িত্ব সে ব্যক্তি খালেস দিলে তাওবা করবে। উক্ত ভাইয়ের/বোনের নিকট যাবে এবং তার সাথে সালাম বিনিময় করবে। সুতরাং সে যদি সালাম বিনিময় করতে যায় কিন্তু অপরজন যদি না করে তাহলে তাওবাকারী দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। দায়ী থাকবে অপরজন।

অবশ্য যে ক্ষেত্রে কোনো শরয়ী কারণ পাওয়া যাবে যেমন–নামায না পড়া, অথবা গোনাহের কাজ বারবার করা। এ ক্ষেত্রে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তাওবা করে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব। তবে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে আরো বড় গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রেও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ নেই। কেননা এর মাধ্যমে কোনো উপকার তো হবেই না বরং আরো ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে।

# চিন্তা-অভিচিন্তা

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

চিন্তা (فكر), বুদ্ধি (عقل), উপলব্ধি (ادراك) ইত্যাদি সব কিছু প্রায় একই অর্থবোধক। অর্থাৎ কোনো বাস্তবতাকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে তাকে মানুষের মস্তিষ্কে পাঠানো এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা (previous information) ও জ্ঞানের সাথে তুলনা ও সমন্বয় করার যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তাকেই বলা হয় ফিকর ( فكر ) বা চিন্তা।

আরবী ভাষায় চিন্তা শব্দের ব্যবহার কয়েকভাবে হয়ে থাকে, যেমন– فكر فى الامر অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে চিন্তাবৃত্তির ব্যবহার এবং জানা বিষয়গুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে অজানা বিষয় আত্মস্থ করার সক্রিয় প্রচেষ্টা করা। افكر فى الأمر অর্থাৎ চিন্তা করা। مفكر শব্দটি এ ধাতু থেকেই নির্গত। فكر কে আরো দৃঢ় ও সমন্বিত করে প্রকাশের জন্য التفكير থেকে নির্গত فكر শব্দটি ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে, এটি فكر শব্দের তুলনায় আরো ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, আভিধানিক অর্থে التفكر হচ্ছে, অজানা বিষয় আত্মস্থ করবার জন্য জানা বিষয়ে চিন্তাবৃত্তির ব্যবহার। التفكير হলো জটিল বিষয়ের সমাধানকল্পে চিন্তাবৃত্তির ব্যবহার। الفكر হলো চিন্তা, افكار এর বহুবচন। অর্থ– গভীর চিন্তামগ্নতা এবং মর্মের অনুসন্ধানে গবেষণায় নিরত হওয়া। এ সবই হচ্ছে চিন্তার আভিধানিক ব্যাখ্যা।

পরিভাষায় চিন্তার সংজ্ঞা নির্ধারণে গবেষকদের মাঝে রয়েছে বিবিধ মত, বিশিষ্ট চিন্তক নুমান আবুল বাশারের মতে, চিন্তার শুদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ সংজ্ঞা হতে পারে এভাবে–'চিন্তা এমন এক মানসিক প্রক্রিয়া, কোনো সমস্যা নিরসনে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে সজ্ঞান চেতনা যার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও অভিজ্ঞতার মাঝে সরল এক শৃঙ্খলা দান করে।'

(introduction about thinking : পৃ. ৬)

পবিত্র কোরআনে 'তারা কি চিন্তা করে না' (أَفَلَا يَتَفَكَّرُوْن), 'তারা কি গবেষণা করে না' (أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْن), 'তোমরা কি বোঝো না' (أَفَلَا تَعْقِلُوْن), 'তারা কি লক্ষ করে না' (أَلَمْ يَرَوْا), 'তারা কি (সৃষ্টি প্রক্রিয়া) অবলোকন করে না' (أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ) এমন বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ কোরআনে ৪৯ বার আকল এবং ১৮ বার ফিকর করতে বলেছেন। যদি যোগ করি তাহলে পুরো কোরআনে আল্লাহ আমাদেরকে কমপক্ষে ৬৭ বার চিন্তা করতে, বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন। (কোরআনের এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ বিশেষভাবে মানুষকে চিন্তা এবং বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন : ৬:৩২, ৭:১৬৯, ৭:১৮৪, ৬:২২, ১০:১৬, ১০:৪২, ১১:৫১, ১২:১০৯, ২১:১০, ২১:৬৭, ২৩:৮০, ২৬:২৮, ২৮:৬০, ৩৬:৬২, ৩৪:৪৬, ২:১৬৪, ১৩:৩-৪, ১৬:১০-১২, ১৬:৬৭-৬৯, ৩০:২৪, ৩০:২৮, ৩৯:৪২, ৪৫:৫, ৪৫:১৩) এ থেকে সহজেই বোঝা যায় আকল এবং চিন্তা-ফিকর আল্লাহর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

চিন্তার আরেক জ্ঞাতিশব্দ 'গবেষণা'। গবেষণা হলো–সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার সাধারণ অর্থ হলো– সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। এর সমার্থবোধক শব্দ হলো–জিজ্ঞাসা, তদন্ত, অন্বেষা, অনুসন্ধান, বিকিরণ এবং নিরূপণ। গবেষণা হলো জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণের লক্ষ্যে তদন্ত করা, তদন্তের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা, সংগৃহীত তথ্যের চিত্র অনুসন্ধান করে জিজ্ঞাসার উত্তর বের করা। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে, গবেষণা হলো পুনঃসন্ধান; অর্থাৎ তুলনামূলক উন্নত পর্যবেক্ষণ করা, ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোঁজা এবং বাড়তি জ্ঞানের সংযোজন করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধান হলো গবেষণা। আরবীতে একে বাহাস বলা হয়, যার অর্থ হলো মাটির ভেতর কোনো কিছু তালাশ করা, খুঁজে বের করা ইত্যাদি।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি বলেন, "বাহাস অর্থ হলো উন্মুক্তকরণ এবং কোনো কিছুর অনুসন্ধান করা।" ড. ইয়াহইয়া ওহাব বলেন, "কঠিন জমিন বা পাথরে গর্ত খনন করা। সুসংবদ্ধ অনুসন্ধান হলো গবেষণা।"

পারতপক্ষে গবেষণা বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি আর্ট। ইংরেজিতে একে research বলা হয়, যার বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। research শব্দটি দুটি শব্দ তথা re এবং search-এর সমন্বয়ে গঠিত। re-এর অর্থ হলো পুনঃ পুনঃ আর search-এর অর্থ হলো অনুসন্ধান করা এবং কোনো কিছু খুঁজে বের করা। research-এর পূর্ণাঙ্গরূপ নিম্নে উল্লেখ

করা হলো–

R-Rational of thinking

E-Expert and Exhaustive treatment

S-Search for solution

E- Exactness

A-Analytical analysis of adequate data

R-Relationship of facts

C- Careful recording, critical observation, Constructive attitude

H- Honesty, Hard work.

তাহলে আমরা উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করলে গবেষণার একটি সম্যক ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। অভিধানে আছে– "জ্ঞানের যে শাখায় নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ও সযত্ন তথ্যানুসন্ধান তা হলো গবেষণা।" (The Advance learner Dictionary of Current English) রেডম্যান ও মরি বলেন– "নতুন জ্ঞান আহরণের সুসংবদ্ধ চেষ্টা-প্রচেষ্টা হলো গবেষণা।"

চিন্তার আরও অনেক প্রতিশব্দ, সহশব্দ আছে। যেমন– عـقـل (আ'ক'ল) অর্থ বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, মানসিকতা, বোধ। فـكـر (ফিকর) অর্থ চিন্তা, উপলব্ধি, অনুধাবন, প্রতিফলন, মাথা ঘামানো।

**চিন্তার বৈশিষ্ট্য**

মানুষকে যে অন্যান্য সব প্রাণীর চেয়ে আলাদা করে দেখা হয়, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, সেটা কী কারণে? মানুষের মধ্যে এমন কী আছে, যা আর অন্য কারও নেই?

মানুষের সেই বিশেষ গুণটি হলো যেকোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা। চিন্তা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, চিন্তা করতে পারার ভেতরেই জেগে আছে মনুষ্যত্ব। এই একটিমাত্র গুণ পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণী থেকে আমাদেরকে অনন্য করে দিয়েছে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু একই সাথে এটাও চরম সত্য যে, যে মানুষটার মাঝে এ গুণটা নেই বা যে মানুষটা তার বাস্তব জীবনে এই গুণটা কাজে লাগায় না, তার সাথে একটা গরু বা গাধার আসলেই কোনো পার্থক্য নেই।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একজন প্রকৃত মানুষ, আদর্শ মানুষ তৈরি করা। এজন্য অবধারিতভাবেই প্রকৃত শিক্ষা আমাদের শিখাবে কিভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্যের কাছে পৌঁছাতে হয়, জীবনকে সত্যিকারের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিই করেছেন যেন আমরা عـقـل (আ'ক'ল) ব্যবহার করি এবং فـكـر (ফিকর) করি। মানুষের জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে আল্লাহকে স্মরণ করবে অথচ তাঁর সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে অভিচিন্তনে লিপ্ত হবে না। এ জন্য হাসান বসরি (রহ.) বলেন– "জ্ঞানীগণ সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করে থাকে। হৃদয়ের সঙ্গে যখন বাক্য বিনিময় করেন তখন প্রজ্ঞার সঙ্গেই করেন।" (ইমাম গাযালি প্রণিত 'আল-হিকমাহ ফি মাখলুকাতিল্লাহ : পৃ. ১৩)

চিন্তা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা চিন্তার উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানা কথা বলেন। তবে যাঁরা সত্যিকার মুসলমান, তাঁরা চিন্তাকে মনে করেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া একটি বিশেষ দান।

আল্লাহ মানুষকে এই সম্পদ দান করেছেন যাতে তা ব্যবহার করে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারে, পৃথিবী গড়তে পারে এবং নববী আদর্শ অনুসারে সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব কর্মজীবনে চিন্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুতরাং চিন্তার ক্ষেত্রেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জরুরি।

বর্তমানের প্রথাগত চিন্তার যে পদ্ধতি তা নিয়ে আমাদের পুনরায় ভাবতে হবে। আমাদের পরীক্ষা করতে হবে চিন্তার যে মূল-লক্ষ্য তা এই পদ্ধতিতে অর্জন হওয়ার মতো কিনা। অর্থাৎ দেখতে হবে তা উবুদিয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে কতটা সহায়ক। যদি তা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের চিন্তার এই প্রচলিত পদ্ধতির অবকাঠামো ভেঙে নতুন চিন্তা-পদ্ধতি ও চিন্তা কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই ভ্রান্ত পদ্ধতি, মানসিক দাসত্ব-শৃঙ্খল এবং যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা সঠিক-সুস্থ চিন্তাকে প্রতিহত করে বা স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতার পথ রুদ্ধ করে, সেগুলো ভেঙে চিন্তার নতুন পদ্ধতি- কাঠামো দাঁড় করাতে হবে।

মুসলমান বলতে তাদেরকেই বোঝায়, যারা আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে, ফলে জাতিবাদী অহংকার তো অবশ্যই, তার মধ্যে কোনো প্রকার অহংকারের ছিটেফোঁটাও থাকার কথা না। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, যিনি নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহর 'বিরাজ' করবার সত্য মানুষের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে ইসলামে বিশ্বাসী বা 'মুমিন' মাত্রই আল্লাহর অস্তিত্বকে সত্য হিসেবে উপলব্ধি করে এই– 'সাক্ষ্য' দেওয়া বা এই সত্যের সাক্ষী হওয়া ইসলামের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের দিক থেকে এর তাৎপর্য অসাধারণ।

মানুষ যখন চিন্তা-ফিকরের ধারাবাহিক চর্চা করে, তখন তা তার পবিত্র অনিন্দ্য অভ্যাসে পরিণত হয় এবং হৃদয় বিনম্র

হয়। নিজ পরিবেশে যা কিছুই তাকে প্ররোচিত করে, উত্তেজিত করে–তাতে সে সুন্দর অনুভূতি ও অনুভবের আহবানেই আলোড়িত হয়, যে অনুভব-অনুভূতি তার অভ্যন্তরীণ চিন্তা প্রক্রিয়া ও আবেগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

কোনো এক আবিদ-উপাসককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "আপনি চিন্তা-ফিকর দীর্ঘায়িত করেন খুব বেশি।" উত্তরে তিনি বলেন যে, "চিন্তাই বুদ্ধির মূল।" সুফিয়ান সাওরি (রহ.) প্রায়ই একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন, যার অর্থ হলো– "ব্যক্তি যখন চিন্তায় ব্যস্ত হয়, তখন প্রতিটি বস্তুতে সে উপদেশ খুঁজে পায়।" (আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম আল জাউযিয়া প্রণিত 'মিফতাহু দারসিস সা'আদাহ' : পৃ. ১৮০)

ইমাম গাযালি (রহ.) চিন্তা বিষয়ে শুধু তত্ত্ব আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি, এর প্রায়োগিত দিকেও অগ্রসর হয়েছেন। এর জন্য নানা রকমের বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি তাঁর 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– "যে মুসলিম নিজ চরিত্রকে সুন্দর দেখতে চায়, তার উচিত প্রথমেই নিজ উদ্যোগে চিন্তা-ফিকির পরিবর্তন করা। এরপর ক্রমান্বয়ে উত্তম চরিত্রের নানা উপাদানের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। আর এভাবেই তার অভ্যাস তৈরি হবে।" গাযালি (রহ.) বিশেষ করে তাগিদ দেন আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের মতোই– "মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় ও বাস্তবিক আচরণের প্রকাশ ঘটাবে; হোক না অনিচ্ছাকৃত। তখন এর প্রভাব তার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। যখনই সে তার চিন্তাধারা ও অনুভব অনুভূতিকে পরিবর্তন করবে, তার বাহ্যিক আচরণও পরিবর্তিত হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে। ইমাম গাযালি (রহ.) থেকে সরাসরি এর বর্ণনা হচ্ছে– "এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, যে সমস্ত উপাদান চর্চার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র অর্জন হতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে, সূচনায় উদ্ভূত সকল আচরণই যেন চূড়ান্তভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়। এ হলো হৃদয় ও মনের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাক করা সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শরীর ও মনের সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ হৃদয়ে যে গুণের প্রকাশ ঘটে, তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পড়ে। তাই দেখা যায়, অন্তরের সম্মতি ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো রকমের আলোড়ন হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে আচরণ ও কর্মের প্রকাশ ঘটে, তার প্রভাব অন্তরে পৌঁছে। বলা যায় এ এক অবিচ্ছেদ্য চক্র।"(এহইয়াউ উলুমিদ্দীন : তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৯, দারুল কলম, বৈরুত হতে প্রকাশিত)


# মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

## এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

| | |
|---|---|
| * | কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়। |
| * | ২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়। |
| * | পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়। |
| * | জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে। |
| * | ২৫% কমিশন দেয়া হয়। |
| * | এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না। |
| * | এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন। |

## গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

### বার্ষিক চাঁদার হার

| | দেশ | সাধ.ডাক | রেজি.ডাক |
|---|---|---|---|
| # | বাংলাদেশ | ৩০০ | ৩৫০ |
| # | সার্কভুক্ত দেশসমূহ | ৮০০ | ১০০০ |
| # | মধ্যপ্রাচ্য | ১১৮০ | ১৩০০ |
| # | মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া | ১৩০০ | ১৫০০ |
| # | ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া | ১৬০০ | ১৮০০ |
| # | আমেরিকা | ১৮০০ | ২১০০ |

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

**ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :**

**শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড**

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

**আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড**

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

# রাসূল (সা.)-এর বাণীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি

মাওলানা সুহাইলুল কাদের

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, তারা মুমিন এবং সৌভাগ্যবান। তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে শান্তি পরকালে মুক্তি। মুমিন হিসেবে সবাই সমান হলেও কিছু মানুষকে হাদীসে সর্বোত্তম অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। সব মানুষই 'উত্তম' উপাধিতে ভূষিত হতে চায়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদেরকে সর্বোত্তম হিসেবে বিশেষায়িত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে যদি আমরা সর্বোত্তম ব্যক্তি বিবেচিত হই, পুরো পৃথিবী অনুত্তম বললে তাতে কিছু আসে যায় না। তাই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় সর্বোত্তম ব্যক্তি কারা, তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করব।

**১. যে কোরআন শেখে এবং শেখায় :**

কোরআন আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান, তাঁর কালামও মহান। যারা কোরআন চর্চায় জড়িত, তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।

(বোখারী, হাদীস : ৫০২৭)

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, জ্ঞানের জগতে কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়, সে হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি। যারা অন্যান্য জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত তাদের তুলনায় তার মর্যাদা অনেক উঁচু। কোরআন নিজে শেখা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া মানে, নিজে সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে অন্যকে উপকৃত করা। তাইতো তাকে সর্বোত্তম ব্যক্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং ভালো কাজ করে; আর বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের একজন।' বিভিন্ন মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ডাকা যায়। একটি মাধ্যম হলো, কোরআন শিক্ষা দেওয়া। এটি সর্বোত্তম পন্থা। পক্ষান্তরে যে কাফের মানুষকে কোরআন থেকে বিরত রাখে, সে হলো সর্বনিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে বিরত রেখেছে।' (ফাতহুল বারী)

**২. চরিত্রবান ব্যক্তি :**

চরিত্র ভালো-মন্দ নিরূপণের মাপকাঠি। যার চরিত্র যত সুন্দর সে তত ভালো হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি সুন্দর। (বোখারী, হাদীস : ৩৫৫৯)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীসে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী তাদের ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তম চরিত্র সমস্ত নবী ও ওলীদের ভূষণ। কাজী ইয়াজ (রহ.) উত্তম চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, উত্তম চরিত্র হলো, মানুষের সাথে নম্র ও ভদ্রভাবে মেলামেশা করা। তাদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশ করা। তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্ট পৌঁছলে সবর করা। অহঙ্কার, বিদ্বেষ, রাগ ও ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা। (আল-মিনহাজ) হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, সুন্দর চরিত্র হলো, উত্তম গুণাবলি অর্জন করা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকা। (ফাতহুল বারী)

**৩. সত্যভাষী ও বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী :**

সত্যিকারের মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। মুসলমান তো হবে সত্যের মূর্ত প্রতীক কথায় এবং কাজে। যারা সত্য বলে, তাদের অন্তর হয় স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ। তাই সত্যভাষী ও বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির ফজীলত একই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত :

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ . قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী

সত্যভাষী ব্যক্তি। তাঁরা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোনো গোনাহ নাই, নাই কোনো দুশমনি, হিংসা ও বিদ্বেষ। (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪২১৬)

**৪. সুন্দর পন্থায় ঋণ পরিশোধকারী :**

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঋণ গ্রহণ ভালো নয়। কারো ঋণ নিতে হলে তার জন্য শরীয়তে রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। যেমন, ঋণ গ্রহণ চুক্তি লিখে রাখা এবং পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা। যারা টালমাটাল ছাড়া নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করে, তাদের প্রশংসায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

ان خياركم احسنكم قضاء

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় ভালো। (বোখারী, হাদীস : ২৩০৫)

পূর্ণ হাদীসটি হলো এই : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তি থেকে একটি উট ঋণ নিলেন। লোকটি ঋণ পরিশোধের জন্য রাসূলের দরবারে এল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তাঁরা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তা পেলেন না। বরং তার থেকে বয়স্ক উট পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন; আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে পরিশোধ করার বেলায় ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। (বোখারী)

**৫. যার কাছে কল্যাণ আশা করা যায় :**

নম্র ভাষা, উদার মন ও অমায়িক আচরণের সুবাদে যে ব্যক্তি মানুষের আস্থাভাজন হয়ে যায়; যার কাছে মানুষ কল্যাণ ও মঙ্গলের আশা রাখে, তাকে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং অনিষ্টের আশঙ্কা করা হয় না। তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায় না। (তিরমিযী, হাদীস : ২২৬৩)

অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যার কাছ থেকে মানুষ দয়া ও অনুগ্রহের আশা রাখে। তার পক্ষ থেকে কষ্ট ও অনিষ্টের ভয় থাকে না। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এমন ব্যক্তি যার কাছ থেকে কল্যাণের আশা এবং অনিষ্টের আশঙ্কা দুটোই বরাবর তার কথা হাদীসে বিবৃত হয়নি। কারণ, তার মাঝে বৈপরিত্যমূলক দুটি বস্তুর সন্নিবেশ ঘটেছে। দুটি বস্তু পরস্পরবিরোধী হলে উভয়টি অস্তিত্ব হারায়। (তুহফাতুল আহওয়াজী)

**৬. মানুষের উপকারী :**

কথায় আছে, মানুষ মানুষের জন্য। মানুষের উপকার করা ইবাদত। অন্যের কল্যাণ সাধন করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خير الناس انفعهم للناس

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সহীহুল জামে হা : ৩২৮৯, দারাকুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬)

**৭. যে সঙ্গী ও পড়শির কাছে উত্তম :**

চলাফেরা, লেনদেন এবং আচার-ব্যবহারে যে ব্যক্তি নিজ সঙ্গী এবং প্রতিবেশীর কাছে ভালো প্রমাণিত হবে সে হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره

আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম। (তিরমিযী, হাদীস : ১৯৪৪)

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভালো করছি নাকি মন্দ তা জানার উপায় কী? তিনি বলেন, যদি তুমি প্রতিবেশীদেরকে এ কথা বলতে শোনো যে, তুমি ভালো করছ, তবে তুমি আসলেই ভালো করছ। আর যদি তাদেরকে বলতে শোনো, তুমি মন্দ করছ, তবে তুমি আসলেই মন্দ করছ। (ইবনে মাজাহ : সহীহ)

**৮. যে পরিবারের কাছে ভালো :**

অনেকে আছে, যারা বাহিরের লোকদের সাথে কোমল কথা বলে, মধুর আচরণ করে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই মেজাজ পাল্টে যায়। পরিবারের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। তাদের চাওয়া-পাওয়া বুঝতে চায় না। অথচ পরিবারই হলো সদাচার পাওয়ার বেশি হকদার। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মাঝে সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে

তার পরিবারের নিকট ভালো। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম। (তিরমিযী, হাদীস : ৩৮৯৫)

**৯. যে শত্রু তথা কাফেরদের ভয় দেখায় :**

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের গুণকীর্তন করে বলেছেন, 'তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর; তাদের পরস্পরে কোমল প্রাণ।' কাফের মুশরিক, বিশেষত যারা মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা উত্তম ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه

মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে নিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে এবং শত্রুরাও তাকে সন্ত্রস্ত করে। (বাইহাক্বীর শু'আবুল ঈমান : ৪২৯১, সিলসিলা সহীহাহ : ৩৩৩৩)

**১০. যে নির্যাতন প্রতিরোধ করে :**

শুধু নিজ গোত্র হওয়ার কারণে যুদ্ধ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসের পরিভাষায় তাকে আসবিয়্যাত তথা গোত্রীয় মনোভাব শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। তবে নিজ গোত্র থেকে আগ্রাসী শক্তির নির্যাতন রোধ করে ইসলাম বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা জিহাদ হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই হাদীসে গোনাহে লিপ্ত না হওয়ার শর্তে নিজ গোত্র থেকে প্রতিরোধের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ

যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে তার গোত্রের ওপর নির্যাতন হওয়া প্রতিরোধ করে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (আবু দাউদ, হাদীস : ৫১২০)

**১১. দীর্ঘজীবী এবং সুন্দর আমলের অধিকারী :**

মানুষের জীবন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। যে নিজের জীবনকে গুরুত্ব দেয় এবং আমলকে সুন্দর করে, সে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আবু বাক্‌রা (রা.) হতে বর্ণিত :

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

কোনো এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে কে নিকৃষ্ট? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস : ২৩৩০)

আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, ব্যবসায়ীর জন্য মূলধন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের জন্য জীবনের মুহূর্তসমূহ তেমন গুরুত্বপূর্ণ। যার মূলধন যত বেশি হয়, সে তত বেশি লাভবান হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের সময় থেকে উপকৃত হয় এবং ভালো কাজ করে, সে সফলকাম হয়। পক্ষান্তরে যে মূলধন তথা সময়কে নষ্ট করে, সে লাভবান হবে তো দূরের কথা; উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী)

**১২. যে জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করে :**

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত। বদর, উহুদ, খন্দক ও তাবুকসহ অনেক যুদ্ধে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দুটোই উৎসর্গ করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ :مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ :ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্?! কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, সে মুমিন ব্যক্তি, যে পর্বতের উপত্যকাসমূহের কোনো উপত্যকায় বসবাস করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদের রক্ষা করে। (নাসায়ী, হাদীস : ৩১০৫ বোখারী, হাদীস : ২৭৮৬ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৮৮)

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদীসে এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে তার ওপর আবশ্যকীয় অন্যান্য ইবাদত আদায় করে এবং জিহাদের ফজীলতও অর্জন করে। এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, যে জিহাদের ফরীজা আদায় করে; কিন্তু অন্যান্য ওয়াজিবাতের ব্যাপারে থাকে উদাসীন। জিহাদের এমন ফজীলত হওয়ার কারণ হলো, তাতে আল্লাহর জন্য নিজের জান ও মাল উভয়টি পূর্ণ উৎসর্গ করতে হয়। তাছাড়া জিহাদের দ্বারা যে উপকার হয়, তা ব্যাপক। হাদীসে একাকী থাকার ফজীলত বিবৃত হয়েছে? কেননা, তার কারণে মানুষ গিবত ও অনর্থক কাজ

ইত্যাদি থেকে বাঁচতে পারে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকা কেবল ফিতনার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (ফতহুল বারী)

**১৩. যে তাঁর প্রভুর ইবাদত করে এবং যুদ্ধ করে :**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আসন্ন ফিতনা সম্পর্কে সচেতন করে গেছেন। দাজ্জালের ফিতনাসহ বিভিন্ন ফিতনার কথা খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। ফিতনা চলাকালে ঈমান বাঁচিয়ে রাখার নিরাপদ পন্থাও বলে দিয়েছেন। তা হলো জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে একাকী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা। যেন ফিতনায় আক্রান্ত না হয়। অন্যথায় অশ্ব হাঁকিয়ে কাফেরদের রিংদ্ধে যুদ্ধ করা। উম্মু মালিক আল-বাহিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلٌ فِى مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّى حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ .

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফিতনার আলোচনা করেন। তা খুব নিকটবর্তী করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফিতনা চলাকালে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে হবে? তিনি বললেন, যে লোক তার পশুপাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, পশুপালের হক্ব (যাকাত) প্রদান করবে এবং তার প্রভুর ইবাদত করবে। আর যে লোক তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে এবং তারাও তাকে ভয় দেখাবে। (তিরমিযী, হাদীস : ২১৭৭)

মুজহির (রহ.) বলেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফিতনা এবং মুসলমানদের পারস্পরিক কলহ থেকে বিরত থাকে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কাফেররাও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। ফলে সে ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পায় এবং গনিমত ও সাওয়াব লাভে ধন্য হয়। (তুহফাতুল আহওয়াজী)

**১৪. যে আমৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে :**

তাবুক যুদ্ধ ছিল এক কঠিনতম যুদ্ধ। কারণ, মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব অনেক। সময়টি ছিল কাঠফাটা গ্রীষ্মকালে। আরবের গরম বলেই কথা। আর সাওয়ারী ও রসদ ছিল অল্প। সাহাবায়ে কেরাম বহু কষ্টে পালাক্রমে কিছুক্ষণ হেঁটে কিছু সময় সাওয়ার হয়ে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তাই তাবুক যুদ্ধের তাৎপর্য অধিক। এই যুদ্ধের কথা কোরআনে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ :رَجُلًا عَمِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْعَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، أَوْ عَلَى قَدَمِهِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ :رَجُلًا فَاجِرًا، يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِى إِلَى شَىْءٍ مِنْهُ.

আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? লোকের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে মৃত্যু অবধি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট হলো ওই পাপাচারী ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু পাপের কাজে কোনো পরোয়া করে না। (নাসায়ী, হাদীস : ৩১০৬ মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১১৩১৯)

**১৫. যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় :**

কিছু মানুষের চেহারা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুন্নাতের সুবাস সুরভিত হয়। আল্লাহর হুকুম, রাসূলের তরীকাই হলো তাদের ভূষণ। লেনদেন ও হুকুকাতের বিষয়ে তারা সচেতন। তাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তারাই উত্তম মানুষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّـهِ، قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিদের কথা জানিয়ে দেব না? তারা বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ হয়। (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪১১৯)

অর্থাৎ তারা তাকওয়া ও খোদাভীতি কিংবা অধিক পরিমাণ আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে এমন হয়ে গেছে যে, মানুষ যখনই তাদেরকে দেখে তখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। (হাশিয়া সিন্দী)

স্থান, কাল, পাত্রভেদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ রেখে বিভিন্ন শ্রেণীকে 'সর্বোত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। মূলত এদের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। যদি কেউ সব গুণ নিজের মধ্যে সন্নিবেশ করতে পারে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাউফিক দান করুন। আমিন।

# জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

## কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

**প্রসঙ্গ : নামাযের জামাআত**

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
হিজলা, বরিশাল।

**জিজ্ঞাসা :**

আমি এক মসজিদের খেদমত করি, অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে চাকরি করি যেমন ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা ইত্যাদি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমাদের মসজিদে জুতা চুরির বিষয়টা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই মসজিদ কমিটি আমাকে বলেছে, আমি যেন মসজিদে জামাআত চলাকালীন অবস্থায় জামাআতের সহিত নামায না পড়ি বরং জুতা পাহারা দিই এবং মুসল্লিগণ চলে যাওয়ার পর নামায পড়ি। এখন আমার জানার বিষয় হলো : এই চাকরিটা কতটুকু শরীয়তসম্মত? এবং আমার করণীয় কী?

**সমাধান :**

পাহারায় থাকার দরুন জামাআতে শরীক হতে না পারলেও জামাআতের সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়, তবে সম্ভব হলে জামাআতে নামায পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়, এমন চাকরির সন্ধানে থাকা উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ-হা. ৫৫১, রদ্দুল মুহতার-১/৫৫৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৯২)

**প্রসঙ্গ : সমিতির অর্থদণ্ড**

মুহাম্মদ আনিছুর রহমান
সালতা, ফরিদপুর।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের এলাকায় মুসলিম যুব সংস্থা নামে ৫ বছর মেয়াদি একটি সমিতি খোলা হয়। এবং বলা হয় যে প্রত্যেকেই প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে জমা দেবে। সাথে সাথে এই টাকাগুলোকে মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ও লাগানো হবে। আর এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা হয় যে কেউ যদি মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে টাকা না দেয়, তাহলে তার থেকে অতিরিক্ত ১০ টাকা জরিমানাস্বরূপ নেওয়া হবে। এবং এই সমিতি থেকে কেউ যদি ৫ বছরের পূর্বে তার টাকা নিয়ে নিতে চায়, তার টাকার লভ্যাংশসহ তার মূল টাকা থেকে কিছু অংশ রেখে দেওয়া হবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো : উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে জরিমানা নেওয়া শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হবে কি? আর যদি সহীহ না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে কী পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

**সমাধান :**

সমিতির কোনো আইন লঙ্ঘন করার কারণে আর্থিক জরিমানা করা বৈধ নয়। তবে হিসাব-নিকাশ রাখতে গিয়ে বাড়তি খরচের প্রয়োজন হলে সার্ভিস চার্জস্বরূপ উক্ত টাকা নেওয়ার আইন করতে পারবে।

অনুরূপভাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যদি কেউ তার টাকা নিয়ে নিতে চায় তাহলে তার প্রাপ্য লভ্যাংশ এবং মূল টাকার কিছু অংশ রেখে দেওয়া যাবে না। বরং তাকে তার পুরো টাকা ও প্রাপ্য লভ্যাংশ দিয়ে দিতে হবে।

(রদ্দুল মুহতার-৪/৬১-৬২, আল বাহরুর রায়েক-৫/৪১, রদ্দুল মুহতার-৪/৩২৭)

**প্রসঙ্গ : ইমামতি, বীমা, ছবি**

মুহাম্মদ মাহমুদ
খিলক্ষেত, ঢাকা।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব লোকদের ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কম্পানির গ্রাহক করে দেন, আর আমরা জানি যে সুদ দেওয়া এবং নেওয়া এবং তার সাক্ষী থাকা নিষেধ। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

১. কোনো ইমাম সাহেব যদি এমন করেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

২. এই কম্পানি শরীয়তসম্মত কি না?

৩. এই ইমাম সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ছাপানো ছবিযুক্ত বই মসজিদের ভেতরে রেকের ভেতরে রাখেন এবং এই বইগুলো সব সময় মসজিদের ভেতরে থাকে। সুতরাং তার শরীয়া বিধান কী?

**সমাধান-১ :**

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়লে তা মাকরূহে তাহরিমী সহকারে আদায় হবে। উল্লিখিত কাজ থেকে তাওবা না করলে তাঁকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা জায়েয হবে না।

(রদ্দুল মুহতার-৫/৪৮৩, হেদায়া-১/১২২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৩/২৯৯)

**সমাধান-২ :**

বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ উলামায়ে কেরামগণ এ দেশে প্রচলিত কোনো বীমা কম্পানির শরীয়তসম্মত হওয়ার ব্যাপারে মতামত পোষণ করেননি। উপরন্ত উক্ত বীমা কম্পানির মাঝে শরীয়তের নিষিদ্ধ বহু কার্যকলাপ তথা সুদ, জুয়া ইত্যাদি বিদ্যমান। সুতরাং এ কথাটি স্পষ্ট যে প্রশ্নে উল্লিখিত বীমা কম্পানিটি শরীয়তসম্মত নয়।

(সূরাতুল বাকারা-৭৫, রদ্দুল

মুহতার-৪/১৭০)

**সমাধান-৩ :**

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বইয়ে থাকা ছবিগুলো যদি কোনো প্রাণীর না হয়, অথবা ছবিগুলো প্রাণীর তবে বইয়ের মাঝে কভার দ্বারা আচ্ছাদিত তাহলে এ ধরনের বই মসজিদের রেকের মধ্যে রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি প্রাণীর ছবি বইয়ের উপরিভাগে দৃশ্যমান হয় তাহলে এ ধরনের বই মসজিদে রাখা যাবে না।

(সহীহুল বোখারী-হা. ৫৯৬০, আদ্দুররুল মুখতার-১/৬৪৮, রদ্দুল মুহতার-১/৬৪৮)

**প্রসঙ্গ : মান্নত**

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
মণিরামপুর, যশোর।

**জিজ্ঞাসা :**

জনৈক মহিলা তার একটি গাভিন বকরির দিকে ইশারা করে বলে যদি আমার অমুক কাজ পুরা হয়ে যায় তাহলে বাচ্চা দেওয়ার পর এই বকরিটি জবাই করে বাড়িতে খাওয়ার জন্য অল্প কিছু গোশত রাখব, আর বাকি সব গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেব। এখন জানার বিষয় হলো :

১. বকরির বাচ্চা মান্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

২. বাড়িতে খাওয়ার জন্য গোশত রাখা যাবে কি না?

৩. উক্ত বকরির পরিবর্তে অন্য বকরি জবাই করা যাবে কি না?

**সমাধান :**

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে

১. বকরির বাচ্চা মান্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. বাড়িতে খাওয়ার জন্য গোশত রাখা যাবে।

৩. উক্ত বকরির পরিবর্তে অন্য বকরি জবাই করা যাবে।

(আদ্দুররুল মুখতার-১/২৯৪, রদ্দুল মুহতার-৩/৭৪১, বাদায়েউস সানায়ে-৬/৩৫৮)

**প্রসঙ্গ : কোরবানী**

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
উখিয়া, কক্সবাজার।

**জিজ্ঞাসা :**

কোনো ব্যক্তি কোরবানির গরু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে মাদরাসায় ৫০০০০ টাকা দেয়, অতঃপর ৫০০০০ টাকায় গরু না পাওয়ায় ৬০০০০ টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করা হয়, বাড়তি দশ হাজার টাকা মাদরাসা থেকে অথবা কোনো হুজুর নিজের পক্ষ থেকে দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

উক্ত কোরবানি এবং দশ হাজার টাকার হুকুম কী?

**সমাধান :**

মুআক্কিল ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করে কোরবানি দেওয়ার জন্য বলার পরে উকিল যদি ৬০,০০০ টাকা দিয়ে গরু ক্রয় করে কোরবানি দেয়, তাহলে পরবর্তীতে মুআক্কিল যদি রাজি হয়ে যায় এবং ওই দশ হাজার টাকা দিয়ে দেয় তখন কোরবানি তার পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। আর যদি রাজি না হয় তাহলে গরু উকিলের হবে, মুআক্কিলকে তার টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এবং মাদরাসা থেকে কোনো টাকা নিয়ে থাকলে তা মাদরাসায় দিয়ে দিতে হবে।

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৩/৫৭৫, ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া-১৭/৪৬১, ইমদাদুল আহ্কাম-৪/১৪৪)

**প্রসঙ্গ : মসজিদ**

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
হবিগঞ্জ, সিলেট।

**জিজ্ঞাসা :**

আমাদের গ্রামে ওয়াক্ফকৃত পাঁচ শতাংশ জমিনের ওপর ছোট একটি মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা নামায আদায় করে আসতে ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে উক্ত মসজিদে মুসল্লি সংকুলান না হওয়ায় এবং তার দু'পাশে মাদরাসা থাকার কারণে বর্তমান মসজিদের জমিদাতা ও এলাকাবাসী মসজিদ ও মাদরাসার সুবিধার্থে উক্ত মসজিদকে (বর্তমান মসজিদের জমি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে পশ্চিম দিকে) অন্যত্র স্থানান্তর করা একান্ত জরুরি মনে করেছেন এবং অচিরেই প্রস্তাবিত নতুন মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। (উল্লেখ্য যে বর্তমান ও প্রস্তাবিত মসজিদের জমিদাতা একই ব্যক্তি)

অতএব মুফতি সাহেবের নিকট আকুল আবেদন এই যে পুরাতন মসজিদের আসবাবপত্র নতুন মসজিদের নির্মাণকাজে ব্যবহার করা যাবে কি না? পুরাতন মসজিদের ওয়াক্ফকৃত (৫ শতাংশ) জমির হুকুম কী হবে? ভবিষ্যতে ঈদগাহ/মসজিদের অজুখানা/ মাদরাসার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? যদি না যায় তাহলে আমাদের করণীয় কী?

**সমাধান :**

কোনো জায়গায় একবার শরয়ী মসজিদ হয়ে গেলে তা কিয়ামত অবধি মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে। তা বিক্রি করা বা স্থানান্তর করা বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদটি মুসল্লি সংকুলান না হওয়ার অজুহাতে স্থানান্তর করা যাবে না। প্রয়োজনে মূল মসজিদ ঠিক রেখে সুবিধামতো পশ্চিম দিকে অথবা বহুতল ভবন নির্মাণ করে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। আর একান্ত প্রয়োজনে ভিন্ন স্থানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে হলে পুরাতন মসজিদকে আপনাবস্থায় বহাল রাখতে হবে।

(সূরাতুত তাওবা-১৮, আদ্দুররুল মুখতার-৪/৩৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া-২/৬৯৮)